দাম : বারো টাকা

ভারতে ক্রিপ্টোকারেন্সির কোনও দরকার আছে কি?
— পৃঃ ১৩

স্বস্তিকা

বাংলাদেশে হিন্দু গণহত্যার মিছিল
— পৃঃ ১৫

৭৪ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা।। ১৮ এপ্রিল, ২০২২।। ৪ বৈশাখ - ১৪২৯।। যুগাব্দ - ৫১২৪।। website : www.eswastika.com

গরমে সুস্থ থাকবেন কী করে

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৪ বর্ষ ৩২ সংখ্যা, ৪ বৈশাখ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

১৮ এপ্রিল - ২০২২, যুগাব্দ - ৫১২৪,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

এলোমেলো করে দে মা লুটেপুটে খাই
□ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

আমরা কারা ? তৃণমূল, ওরা কারা ? তৃণমূল
□ সুন্দর মৌলিক □ ৭

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে এক ছাতার নীচে আনা প্রয়োজন □ এন. ভি. রমন □ ৮

ঔষধের মূল্যবৃদ্ধি : তথ্য, সত্য, অর্ধসত্য ও ভারতবর্ষ
□ দেবযানী ভট্টাচার্য □ ১১

ভারতে ক্রিপ্টোকারেন্সির কোনও দরকার আছে কি?
□ শেখর সেনগুপ্ত □ ১৩

বাংলাদেশে হিন্দু গণহত্যার মিছিল
□ সুদীপনারায়ণ ঘোষ □ ১৫

পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষায় বসুন্ধরা দিবসের গুরুত্ব বাড়ছে
□ সরোজ চক্রবর্তী □ ১৭

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থা কোন পথে?
□ তরুণ কুমার পণ্ডিত □ ১৮

গরমের ব্যারামে আরাম □ ভবানীশংকর বাগচী □ ২৩

গরমকালে ছাতা ছাড়া বাইরে বেরোবেন না
□ ডাঃ অরিন্দম বিশ্বাস □ ২৪

গরমে বাচ্চাদের রোদে বেশি বেরোতে দেবেন না
□ ডাঃ সুশান্ত মিত্র □ ২৭

গরমে প্রতিদিনের ডায়েটে টক দই অবশ্যই রাখুন
□ ত্রিয়া সিংহ □ ২৯

ব্রতিনীর মনের সাধ না মেটা অবধি চলতে থাকে ব্রত
□ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী □ ৩১

পশ্চিমবঙ্গে ৩৫৬ ধারার প্রয়োগ একান্তই প্রয়োজনীয়
□ রামানুজ গোস্বামী □ ৩৬

শিখধর্মের আশ্রয় নিলেন তেলেঙ্গানা জনজাতির মানুষরা
□ কৌশিক রায় □ ৩৭

দলে বেলাগাম দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ সুপ্রিমো
□ বিশ্বপ্রিয় দাস □ ৪৩

অসমে সঙ্ঘকাজের বিস্তার এবং হৃদয় বিদারক ইতিহাস
□ অসিত চক্রবর্তী □ ৪৪

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ সমাবেশ সমাচার : ৩৫ □ রঙ্গম : ৩৮ □ অন্যরকম : ৩৯ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৪৯ □ চিত্রকথা : ৫০

প্রকাশিত হবে ২৫ এপ্রিল ২০২২

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২৫ এপ্রিল ২০২২

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

পশ্চিমবঙ্গ কি শ্রীলঙ্কার পথে?

ঋণে জর্জরিত শ্রীলঙ্কা এখন প্রায় দেউলিয়া। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক চিত্রটাও অনেকটা শ্রীলঙ্কার মতো। যদিও একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের সঙ্গে একটি প্রদেশের তুলনা যুক্তিসঙ্গত নয়। কিন্তু শ্রীলঙ্কার ভরাডুবি দেখার পর অনেকের মনেই এই প্রশ্নটি উঠছে। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয়ও এটাই। লিখবেন ড. রাজলক্ষ্মী বসু, পায়েল চট্টোপাধ্যায়, ড. জয়ন্ত দত্ত প্রমুখ।

দাম একই থাকছে, বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

বিশেষ আবেদন

প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত পাঠানো সত্ত্বেও ডাকযোগে বহু গ্রাহকই স্বস্তিকা ঠিকমতো পাচ্ছেন না— এরকম অভিযোগ আমরা হামেশাই পাচ্ছি। এবিষয়ে ডাকবিভাগে যোগাযোগ করেও কোনো সুফল পাওয়া যাচ্ছে না।

তাই, আমরা রেজিস্ট্রি পোস্টের মাধ্যমে স্বস্তিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি। যাঁরা রেজিস্ট্রি খরচ বহন করতে আগ্রহী তাঁরা রেজিস্ট্রি খরচ কার্যালয়ে জমা দিলে আমরা তাঁদের স্বস্তিকা রেজিস্ট্রি ডাকের মাধ্যমে পাঠানোর ব্যবস্থা করবো।

রেজিস্ট্রি খরচ—

প্রতি সপ্তাহে ২২.০০ টাকা।

এক মাসের পত্রিকা একসঙ্গে পাঠালে ৩০.০০ টাকা।

(বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ছাড়াও এই রেজিস্ট্রি খরচ অতিরিক্ত দিতে হবে।)

—ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্

আমাদের শাস্ত্রে বলা হইয়াছে শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্। অর্থাৎ সমস্ত কর্তব্যকর্ম সিদ্ধ করিবার একমাত্র মাধ্যম হইল আমাদের শরীর। পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর মতোই মানুষও স্বীয় শরীরের মাধ্যমে সবকিছুই প্রাপ্ত করিয়া থাকে। সমস্ত রকম কামনা বাসনার পূর্তিও শরীরের মাধ্যমেই হইয়া থাকে। সেইজন্য নিজের এই অমূল্য শরীরকে রক্ষা করা বা তাহাকে নীরোগ রাখা মানুষের সর্বপ্রধান কর্তব্য। শরীরকে নশ্বর মনে করিয়া তাহাকে অবহেলা করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারিবে না। শরীরের মাধ্যমেই মানুষ পঞ্চঋণ অর্থাৎ দেবঋণ, ঋষিঋণ, মাতৃঋণ, পিতৃঋণ ও ভূতঋণ হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। এই শরীর রক্ষার নিমিত্ত আমাদের শাস্ত্রে দিনচর্যা, ঋতুচর্যা-সহ সঠিক আহার-বিহারের বর্ণনা রহিয়াছে। আমাদের মহাপুরুষগণও জীবন ও প্রকৃতির সমস্ত দিক পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করিয়া বিশ্বমঙ্গলের নিমিত্ত এক আদর্শ জীবন পদ্ধতি বিকশিত করিয়াছেন। তাঁহারা আমাদিগকে এমন কিছু জীবনসূত্রের সন্ধান দিয়াছেন যাহা পালন করিয়া মানুষ শারীরিক ও মানসিকরূপে সুস্থ থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে পারে। পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের অধিকারী ব্যক্তিই যথার্থ সুখ লাভ করিতে পারেন। মহর্ষি চরক সুস্থ জীবনের জন্য তিনটি স্তম্ভের কথা বলিয়াছেন। তাহা হইল আহার, নিদ্রা এবং গৃহস্থাশ্রমে সম্যক কর্মভোগ। তাঁহার মতে সুস্থ জীবনের প্রথম স্তম্ভ হইল সম্যক আহার। শরীরের জন্য আহার হইল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইহার দ্বারাই শরীরের পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে। শাস্ত্রে বর্ণিত রহিয়াছে, মানুষের সর্বপ্রথম শুদ্ধ, সাত্ত্বিক ও পুষ্টিকর আহারের সংস্থান করা অতীব প্রয়োজন। কেননা আহারের দ্বারাই শরীরে রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ইত্যাদি সৃষ্টি হইয়া থাকে। সেইজন্য ভারতবর্ষের ঋষিগণ হিতকর আহারকে পথ্য বা খাদ্য এবং অহিতকর আহারকে অপথ্য বা কুখাদ্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

মানুষ পরহিতে কাজ করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার জন্য খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকে আর মনুষ্যেতর প্রাণীরা শুধুমাত্র খাইবার জন্যই বাঁচিয়া থাকে। মনুষ্য মধ্যেও যাহারা খাইবার জন্যই বাঁচিয়া রহিয়াছে তাহারাও পশুদের মতোই অকালে ধরাধাম হইতে বিদায় লইয়া থাকে। খাদ্য কীরূপ হইবে শাস্ত্রে তাহার বর্ণনায় বলা হইয়াছে – তৃপ্তিকারক, বলবর্ধক ও স্মরণশক্তিকারক। পাকস্থলীকে ডাস্টবিন মনে করিয়া খাদ্যগ্রহণকারীদের রাক্ষস বলা হইয়াছে। কল্যাণকামী মানুষের দীর্ঘজীবন লাভের জন্য প্রাকৃতিক, পুষ্টিকর, বলবর্ধক, টাটকা ও সুপাচ্য খাদ্য গ্রহণের কথা বলা হইয়াছে। অখাদ্য গ্রহণের কারণেই সমস্ত রোগ হইয়া থাকে। শুধুমাত্র শরীরের রোগ নহে, ইহাতে মন ও বুদ্ধিও দূষিত হইয়া পড়ে। পাশ্চাত্যের ভোগবাদী সংস্কৃতির মোহে পড়িয়া, অখাদ্য-কুখাদ্য গ্রহণ করিয়া বর্তমান প্রজন্মের সিংহভাগ শুধু শারীরিকভাবে রোগাক্রান্তই নহে, মানসিক বিভ্রমেরও শিকার হইয়া পড়িয়াছে। পাশ্চাত্যের অতিনিদ্রা, অতিজাগরণ, অতিভোজন, অতিপান ও অতিস্নানের সংস্কৃতি ভারতীয় সমাজকে কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছে। শ্রীশ্রী রবিশঙ্কর, যোগগুরু রামদেব বাবা প্রমুখ এই বিষয়ে সমাজকে সাবধান করিবার কাজ করিয়া চলিয়াছেন।

আহার বিষয়ে প্রথম কথা হইল, প্রত্যেক ব্যক্তিকে ঠিক করিতে হইবে যে, ঋতু অনুযায়ী তাহার পক্ষে উপযুক্ত আহার কীরূপ হইবে। কেননা আহারের উপরেই ব্যক্তির স্বভাব নির্ভর করে। খাদ্য গ্রহণের সময়ে হিতকারী ও অহিতকারী সংযোগও অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে। অর্থাৎ পরস্পর বিরুদ্ধ খাদ্য একই সঙ্গে গ্রহণ করা চলিবে না। শরীর থাকিলে রোগও থাকিবে। বলা হইয়াছে শরীরং ব্যাধি মন্দিরম্। কিন্তু মানুষ নিজেই তাহার শরীরকে ব্যাধি মন্দির করিয়া তুলিতেছে। আচার-ব্যবহার, খাদ্যাখাদ্য গ্রহণে আমরা যদি সচেতন হইতে পারি, তাহা হইলে আমরা অনেক রোগের হাত হইতে রেহাই পাইতে পারি। আর তখনই চিকিৎসকরা আমাদের সুস্থ শরীরে দীর্ঘ জীবনের গ্যারান্টি দিতে পারিবেন।

সুভাষিতম্

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ।

রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ।। (শ্রীশ্রীগীতা ১৭/৮)

যে সব আহার আয়ু, উদ্যম, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতি বর্ধন করে এবং সরস, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর ও মনোরম, সেগুলি সাত্ত্বিক লোকেদের প্রিয় হয়।

এলোমেলো করে দে মা লুটেপুটে খাই

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

আগামী সপ্তাহেই শিল্প সম্মেলন। থাকতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আর নামজাদা শিল্পপতিরা। তবে রামপুরহাট নরহত্যা আর নদীয়াতে হাতরাস উন্নাও ধাঁচের নারী নির্যাতনের পর লজ্জায় মুখ ঢেকেছে 'ঋষিরাজ্য পশ্চিমবঙ্গ।' বাম জমানায় ফেলানি বসাক, চম্পলা সর্দার থেকে তাপসী মালিকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন বধির হয়ে গিয়েছেন। সুবিধা পেতে পেতে তাঁর বশংবদ পরজীবী বুদ্ধিজীবীর দল চাটুকারিতার যোগ্যতাটুকুও হারিয়েছে। উপদেশ দেওয়া তো দূরের কথা। আগস্টে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। দুটি ক্ষেত্রেই মমতার ভূমিকা গুরত্বপূর্ণ।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নিজেদের প্রার্থী জেতাতে ৯১৯৪ ভোটে পিছিয়ে বিজেপি। মমতা হুমকি দিয়েছেন তাঁর সাহায্য ছাড়া জিতবে না বিজেপি মনোনীত প্রার্থী। আবার মোদী বিরোধী জোট গড়তে বিজেপি বিরোধী সব দলের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন। মমতার ভাষা বোঝা দায়। চতুর রাজনীতিক হিসেবে মমতা 'দাঁড়ি-পাল্লার' ভাষা জানেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দেশজুড়ে ৪৮৯৬ জন বিধায়ক আর সাংসদ ১০,৯৮,০৯৩ মূল্যের ভোট দেবেন। সাংসদের ভোটের মূল্য ৭০৮ আর বিধায়কের ২০৮। দাঁড়িপল্লার খেলার অন্যায় সুযোগ নিচ্ছে অনেকে। তাতে মমতার মদত রয়েছে। তবে মমতা অসহায়। দলের রশি তাঁর হাতে নেই। তাঁর বড়ো প্রমাণ ফেব্রুয়ারিতে এক সপ্তাহের মধ্যে দুবার জাতীয় কমিটি পুনর্গঠন আর সরিয়ে দেওয়া উত্তরসূরি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্বমহিমায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা। পার্টি বা দল বাড়লে বেনোজল ঢোকে বলে জানিয়েছিলেন বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান শৈলেন দাশগুপ্ত। মমতার দল বেনোজলে ডুবে গিয়েছে। অনেকে ঠাট্টা করে বলছেন কোভিড শয্যার মতো হাসপাতালে তৃণমূল নেতাদের জন্য সিবিআই-ইডি শয্যার ব্যবস্থা রাখা উচিত।

আপাতত তৃণমূলের ২০ সদস্যের জাতীয় কমিটির ৭ নেতা বিভিন্ন অনৈতিক কাজে অভিযুক্ত। রয়েছেন তাঁর ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আর বীরভূমের 'কেষ্ট' অনুব্রত মণ্ডল। বহুদিন তাদের বিরুদ্ধে সিবিআই আর ইডি-র তদন্ত চলছে। এর শেষ কোথায় কেবল সিবিআই আর ইডি জানে। দু' একজন বাদ দিলে ৩২ সদস্যের রাজ্য কমিটির অবস্থা খানিকটা ভালো।

পাচার-বঙ্গ জুড়ে লুটপাট, খুনজখম আর নারী নির্যাতন চলছে অবাধে। ২০২১-২২-এ পরপর ৩টি ভোট জেতার পর নিজেদের কর্মী, অফিসার আর পুলিশ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে তৃণমূল দল আর প্রশাসন। বাম অত্যাচার সরিয়ে ২০১১-তে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ঘর গুছিয়ে নেওয়ার প্রবণতা তৈরি হয় তৃণমূলে। অনেকের মতো প্রথম থেকেই 'যা পারি গুছিয়ে নিই' আর 'এলোমেলো করে দে মা লুটেপুটে খাই' এই ভাব নিয়ে রাজ্য চালাতে শুরু করে। ২০১৬ আর ২০২১-এর নির্বাচনের পর থেকে তা বেড়েছে। ২০১৩ থেকেই কেলেঙ্কারি মমতা সরকারের পিছু নেয়। 'লেলানো তত্ত্ব', অর্থাৎ কেন্দ্র ইচ্ছা করে মমতা ঘনিষ্ঠদের উপর ইডি সিবিআই লেলিয়ে দিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে পাচার বা কাটমানি কালচার কোনোদিন ছিল বলে মনে পড়ে না। মমতা জমনাতেই তার শুরু।

বামপন্থীদের বিপরীত মমতা রাজ্যের কোনো মৌলিক পরিবর্তনে আগ্রহী নয়। যেমন ভূমি সংস্কার। বামেরা তাদের অন্য মৌলিক পরিবর্তন লাঠির জোরে মানুষের কাছে প্রমাণ করতে গিয়ে ক্ষমতাশূন্য হয়ে যায়। অনেকেই বলেন বাইরে থেকে বামেদের ভালো ছাত্রী মমতা। জ্যোতি বসু বলেও ছিলেন 'উনি তো জঙ্গি বামপন্থীদের মতন কাজ করেন। ওখানে কী। এদিকে চলে আসুন'। মমতা দল গড়েন ১৯৯৮-এ আর বসু মুখ্যমন্ত্রী পদ খোয়ান ২০০০ সালে। মমতা মৌলিকতা ছেড়ে তাই বিনামূল্যে বিতরণে নেমেছেন। তাঁর কোষাগার প্রায় শূন্য। ১১ বছরে বামেদের রেখে যাওয়া ঋণের অভিশাপ তিনি প্রায় ৬ গুণ বাড়িয়ে ৬ লক্ষ কোটি টাকা করে ফেলেছেন। আর সেই বিনামূল্যে বিতরণ সুযোগ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে পাচার রাজ্য বানিয়ে ফেলেছেন অভি-কেষ্টরা। মমতার নাকের ডগায় চলছে 'এলোমেলো করে দে মা লুটেপুটে খাই'। ■

মমতা মৌলিকতা ছেড়ে বিনামূল্যে বিতরণে নেমেছেন। তাঁর কোষাগার প্রায় শূন্য। ১১ বছরে বামেদের রেখে যাওয়া ঋণের অভিশাপ তিনি প্রায় ৬ গুণ বাড়িয়ে ৬ লক্ষ কোটি টাকা করে ফেলেছেন। আর সেই বিনামূল্যে বিতরণ সুযোগ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে পাচার রাজ্য বানিয়ে ফেলেছেন অভি-কেষ্টরা।

আমরা কারা ? তৃণমূল ওরা কারা ? তৃণমূল

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

শুভ নববর্ষ।

প্রতি বছর বাংলা নববর্ষ সূচনার পরে প্রথম যে চিঠিটা লিখি সেটা আপনাদের উদ্দেশেই। জানি, ভুলে গেছেন। আসলে আপনারা তো বাঙ্গালি। অতএব, ভুলে যাওয়ায় মৌলিক অধিকার। আমার দিদি মানে মমতা দিদি জানেন, আপনারা ভুলো মন। আপনারা তাই কোনও দিনিই মনে রাখবেন না করোনার সময়ে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার কী কী করেছেন। আপনারা সেসব ভুলে কিছু না করা দিদিকেই ভোট দিলেন। আহা রে! পা ভাঙা মেয়েটা কীভাবে বাঙ্গলার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছুটছে! ওকেই ভোট দেওয়া উচিত। একবারেই ঠিক করেছেন। বাঙ্গালি মাত্রেরই তাই করা উচিত। অথচ আপনারা জানতেন নন্দীগ্রামে ঠিক কী হয়েছিল? তাতে অতদিন প্লাস্টার করে রাখার দরকার ছিল কি না? আদৌ দিদিকে দেখে কেউ বোম ছুঁড়েছিল কি না? না, না, ওসব মনে না রেখে ঠিক করেছেন।

আপনারা ভুলে গিয়েছেন গণতন্ত্রের পীঠস্থান বিধানসভা ভবন দিদির নেতৃত্বে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। তার পরেও রাজ্যের গণতান্ত্রিক দায়িত্ব দিদিকেই দিয়েছেন। বারবার দিয়েছেন। ঠিকই করেছেন। দিদির মতো আর কে পাকস্ট্রিট থেকে হাঁসখালির ঘটনাকে 'ছোট' বলে অন্যদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে জানেন। আসলে বাঙ্গালিকে দিদির মতো আর কেউ চেনেন না। দিদি জানেন, একটা ছোট্ট মেয়ে প্রেম করেছিল, গর্ভবতী হয়েছিল, তার পরে মরে গিয়েছে বললে আপনাদের টিভি সিরিয়াল দেখা মন আনন্দে নেচে উঠবে। তাই তো দিদি ওরকম করে বলেছেন। এই সুযোগে একটা কথা জানিয়ে রাখি। পাঁচকান করবেন না প্লিজ। রাজনীতি থেকে অবসরের পরে দিদি আর কবিতা লিখবেন না, গানও গাইবেন না। তিনি ঠিক করে রেখেছেন টিভি ধারাবাহিকের স্ক্রিপ্ট লিখবেন। ওঁর মতো গল্প সাজানোর ক্ষমতা আর কারও নেই। আপনারা হয়তো জানেন না, ইতিমধ্যেই দিদির হাতে এমন প্রাইজ আছে যা শুনলে আপনারাও গর্বে একবেলা খাওয়া ভুলে যাবেন। বিশ্বের সবচেয়ে মঞ্চ সফল নাটকের লেখক, নির্মাতা, অভিনেত্রী, পরিচালক সবই তিনি। এক এবং একাই তিনি 'কে ভেঙেছে পা' নামে নাটকের মাধ্যমে রাজ্যে গরিষ্ঠতা পেয়ে গিয়েছেন।

দিদির আর একটা নাটকও ইতিমধ্যেই হিট। নাম, 'ছেলে খাবে মদ, মা পাবে টাকা'। বুঝতে পারলেন না! জানতান। আপনাদের ভুলো মন যে। দিদির এই নাটক প্রকল্পে সন্তানকে বেশি করে মদ খেতে বলা হচ্ছে। তা হলে সরকারের রোজগার বাড়াবে। সেই টাকায় মায়ের 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' ভরবে। ছেলে বাড়ি গিয়ে একটু অশান্তি করবে কিন্তু তাতে কি! মা তো লাইনে দাঁড়িয়ে টাকা পাচ্ছেন। মদ্যপ বরের হাতে পিটুনি খেলেও রাস্তায় দাঁড়িয়ে ৫০০ টাকা নিয়ে বউ হেসে হেসে বলে, 'আমাদের মমতা দিদি দিয়েছে গো!' একটা নাটকে দিদি এটা ভুলো মন বাঙ্গালিকে বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন যে ছেলে বা বর মদ পান না করলে ৫০০-র থেকে বেশি টাকা দিতে পারত।

এই নববর্ষে সবাই প্লিজ দিদির প্রতি করুণা দেখান। এমন সংকট যেন কোনও শত্রুর জীবনেও না আসে। প্রাণাধিক প্রিয় ভাইপোকে নিয়মিত দিল্লি গিয়ে সিবিআই, ইডি করতে হচ্ছে। বউমা রুজিরাকে কোলের বাচ্চা সামলে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার সমন সামলাতে হচ্ছে। বড়ো আদরের কেষ্ট হাসপাতালে লুকিয়ে রয়েছে। এই চৈত্র সংক্রান্তিতে রাস্তায় রাস্তায় উন্নয়নের পাশে দাঁড়িয়ে ওর জল-বাতাসা বিলি করার কথা ছিল। কিন্তু এখন হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে দিন গুনছেন। মানে কবে সিবিআই তুলে নিয়ে যাবে তার জন্য দিন গুনছেন।

ওদিকে মোটা-ভাই পার্থ। ব্যাটাকে শিক্ষামন্ত্রী থেকে শিল্পে নিয়ে এসে ঘরে গ্যারেজ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নিয়োগ-টিয়োগে এত দুর্নীতি করে রেখেছে যে, দিদির মান-সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে যাচ্ছে। সিবিআই যে কোনও দিন ডাকতে পারে। জেলখাটা কুণালটাকে নতুন করে কোলে বসালেন অথচ সেটাও গদ্দার বেরলো। আজ পার্থর নামে, কাল ববির নামে, পরশু অনুব্রতর নামে চুকলি কাটছে।

দিদি, কার উপরে ভরসা করবে বলতে পারেন! জেলায় জেলায় ভাইগুলো সব ধরাকে সরা জ্ঞান করতে লেগেছে। ওরে তোরা টাকা কামা, অট্টালিকা বানা, সিন্ডিকেট কর, তোলাবাজি চালা। কাজের তো কমতি নেই। ধর্ষণটর্ষণ করছিস কেন! 'ছোটোখাটো' গোলমাল হয়ে গেলে রাতের অন্ধকারে পুড়িয়ে দে, পুঁতে দে। তা নয়, সবেতে ধরা পড়ে যাচ্ছে। পরিস্থিতি এমন হয়ে গেছে যে, আমরা তৃণমূল ঠিক আছে কিন্তু ওরা মানে চোর, ডাকাত, ধর্ষক, লুটেরা, খুনেরাও তৃণমূল। দিদির মন্ত্রীসভা থেকে পঞ্চায়েত কোথাও কোনও অভিযোগ উঠলেই দেখা যাচ্ছে সব্বাই তৃণমূল। এমনটা হলে কি দিদির মাথার ঠিক থাকে। রোজ খুন, ধর্ষণ লেগেই আছে। তাতে আবার মহাগরম কালটা আসছে। ঝড়বৃষ্টিও আসছে। ঝড়বৃষ্টি মানেই টাকা কামাই। সে সবও টুপিটাপা দিয়ে ম্যানেজ করতে হবে। দিদির মাথাটার যে কী হবে!

তাই বলছি, হে বাঙ্গালি, ভুলে যান সব। দিদি কী বলছেন শুনুন কিন্তু ভুলে যান। ভাবুন, মাথার ঠিক থাকলে তিনি কখনো এগুলো বলতে কি! আপনাদের মঙ্গল হোক। ▯

অতিথি কলম

এন. ভি. রমন

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে এক ছাতার নীচে আনা প্রয়োজন

রাজনৈতিক নির্দেশদাতারা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতাসীন হয়ে বদলে যাবে। কিন্তু আপনাদের সংস্থাগুলি চিরস্থায়ী। তাই স্বাধীনতার সঙ্গে আপোশ নয়। সার্ভিসের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে আপনার অন্য সহযোগীরাই আপনার শক্তি।

আজকাল অনেকেই প্রসিদ্ধ ও প্রখ্যাত সর্বভারতীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে লাগাতার কটু মন্তব্য করে চলেছে অথচ সুবিচার পেতে তাদেরই আবার ডাকছে। এমন একটা দোলাচলের মধ্যে সংস্থাগুলির তরফে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ধরে রাখা শুধু নয় তাকে আরও সুদৃঢ় করতে অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলাকে কঠিন করতে হবে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোনো ধরনের স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা যাতে সিস্টেমকে ভেঙে না দেয় তা দেখা জরুরি।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে আমরা দেখেছি আমাদের মতো নানা ভাষা সংস্কৃতির দেশে গণতন্ত্রই শাসন চালানোর সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। আমাদের বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ সংস্কৃতি কখনোই একনায়কতান্ত্রিক শাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না। হ্যাঁ, কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমেই আমাদের ইতিহাস, উত্তরাধিকার, বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতাকে ধরে রাখা যেতে পারে। একইসঙ্গে শক্তিশালীও করা যায়।

আমরা স্বাধীনতা-প্রিয় জাতি। যখনই আমাদের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার মতো কোনো প্রচেষ্টা হয়েছে ইতিহাস সাক্ষী আমাদের চিরসজাগ নাগরিকরা সেই প্রচেষ্টাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করে স্বৈরতান্ত্রিক শাসকের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটেই আমাদের সুবিশাল পুলিশবাহিনী ও বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থাগুলির তরফে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও প্রথাগুলি সংরক্ষণের সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে হবে। রাজনৈতিক শাসনকর্তার কোনো স্বৈরতান্ত্রিক নির্দেশ চোখবুজে মেনে নেওয়ার আগে ভাবতে হবে। পুলিশ ও তদন্তকারী সংস্থাগুলির এক ধরনের তথাকথিত বৈধতা অবশ্যই আছে কিন্তু সামাজিক বৈধতা বলতে যা বোঝায় তা এখনও পুরোপুরি অর্জিত হয়নি। এই ক্ষেত্রে সামাজিক মান্যতার দিকে আরও অগ্রসর হতে গেলে পুলিশকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করে যেতে হবে এবং অপরাধ যাতে সংঘটিত না হয় আগে থেকেই সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এই ক্ষেত্রে তারা জনগণের সহযোগিতা নিয়ে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যাতে বিঘ্নিত না হয় সেই কাজ যৌথভাবে যত করতে পারবে সমাজে তাদের গ্রহণযোগ্যতা তত বাড়বে।

অনেকের স্মরণে থাকতে পারে, সিবিআই প্রতিষ্ঠার পর প্রারম্ভিক বছরগুলিতে তারা জনগণের বিপুল বিশ্বাস অর্জন করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আর পাঁচটা পাবলিক সংস্থার মতো তাদের কাজকর্মও নাগরিকদের তীব্র নিরীক্ষণের মধ্যে পড়ে। সংস্থার কাজ এবং বহু ক্ষেত্রে নাগরিক নজরে অকাজ সিবিআইয়ের বিশ্বাসযোগ্যতাকেই সন্দেহের মুখে ফেলে দেয়। অবশ্যই কিছু কিছু মামলার ক্ষেত্রে। এমনটাও দেখা গেছে যথেষ্ট অসহায়তার মধ্যেও মানুষ পুলিশের কাছে যেতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। এর মূলে কাজ করছে পুলিশের দুর্নীতিগ্রস্ত ভাবমূর্তির অভিযোগ। এটা সামগ্রিকভাবে পুলিশবাহিনীর ক্ষতি করেছে, তাদের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে। বহুক্ষেত্রেই পুলিশের তরফে অতি সক্রিয়তা, নিরপেক্ষতার প্রকট অভাব সর্বোপরি শাসক শক্তির সঙ্গে যোগসাজস ও তাদের তাঁবেদারি করাটা জনতাকে সম্পূর্ণ হতাশ করেছে।

অন্যদিকে পুলিশের তরফ থেকেও অভিযোগ এসেছে রাজনৈতিক শাসন ক্ষমতায় পরিবর্তন আসার সঙ্গে সঙ্গে তাদের হয়রানি শুরু হয়ে থাকে। এই অবস্থায় দুটি কাজ জরুরি। সামাজিক বৈধতা অর্জন যেটি করতে গেলেই জনতার বিশ্বাস অর্জনের

বিষয়টি এসে পড়ে। এটা করার ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ হবে রাজনৈতিক প্রভুর সঙ্গে যোগসাজস বা যোগসূত্র ছিন্ন করা। সমাজের সেরা প্রতিভাবানরা এই 'সার্ভিসে' যোগ দেন যোগ্য সম্মান ও সামাজিক মান্যতা ও সম্ভ্রম পাওয়ার আশায়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় ন্যায়নিষ্ঠ, সৎ অফিসারেরা বহু ক্ষেত্রেই তাদের চাকরিতে নিযুক্তির পূর্বে নেওয়া সততা ও নিরপেক্ষতার শপথের মর্যাদা রক্ষা করতে পারেন না। এক্ষেত্রে এই সত্য অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে অন্যান্য পাবলিক সংস্থাগুলি যতই অপদার্থ বা নিকম্মা হোক না কেন, এমনকী তারা যদি কাজে সহযোগিতা নাও করে তবুও নিজেদের সংস্থার সকলে যদি এককাট্টা হয়ে নিজেদের শপথের কথা মাথায় রেখে সম্মিলিতভাবে নীতিনিষ্ঠতা মানতে বদ্ধপরিকর হয় সেক্ষেত্রে কোনো বাধাই পথ আটকাতে পারবে না। কর্তব্য সমাধা আমাদের আন্তরিকভাবে করতেই হবে।

এই আপ্তবাক্যটি সমস্ত সংস্থার ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। এখানেই আসে নেতৃত্বের প্রশ্ন। নেতার গুণেই সংস্থার ভালো-মন্দ অনেকাংশে নির্ভর করে। সেই কারণে কিছু নিষ্ঠাবান, দৃঢ়চেতা আধিকারিক নিম্নগামী সংস্থাতেও বিপ্লব ঘটিয়ে দিতে পারেন। এই সূত্রে আমি সংস্থার ক্ষতি করছে এরকম কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করব। (১) উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব, (২) পর্যাপ্ত কর্মীর অভাব, (৩) বিশেষ করে নীচের দিকের কর্মীদের অমানবিক কাজের পরিবেশ, (৪) প্রমাণ সংগ্রহ করার পদ্ধতিগুলি আদৌ বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, (৫) সর্বোপরি বহু ক্ষেত্রেই আধিকারিকরা কাজের আচার সংহিতা লঙ্ঘন করেন কিন্তু তাঁদের দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় না। দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দোষী সাব্যস্ত কমই হয়।

অন্যদিকে, এমন কিছু বিষয় রয়েছে যেখানে সিবিআই মামলায় অস্বাভাবিক দেরি হয়। (১) মামলা লড়ার মতো পাবলিক প্রসিকিউটর ও সরকারি কৌঁসুলির অভাব, (২) বারবার আদালতে মুলতুবি চাওয়া, (৩) শত শত সাক্ষীর জবানবন্দি নিয়ে হাজার হাজার পাতার চার্জশিট দাখিল, (৪) মামলা চলাকালীন দীর্ঘদিন সম্ভাব্য আসামিদের জেলবন্দি রাখা, (৫) রাজনৈতিক ক্ষমতার রদবদল হলেই বহু মামলার ক্ষেত্রে গুরুত্ব কমানো-বাড়ানোর রীতি, (৬) এই সূত্রেই বহু আধিকারিকের অনবরত বদলি যার ফলে বহু ক্ষেত্রেই মামলার অভিমুখ তথা গতিপ্রকৃতি বদলে যায়। এরই ফলে প্রায়শই দোষী ছাড়া পেয়ে যায় আর নির্দোষ সাজা ভোগ করে। পরিণতিতে জনমনে সংস্থা সম্পর্কে তীব্র হতাশা ও ক্ষোভের জন্ম হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষ আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে না আর আদালতের পক্ষেও এত চাপ নেওয়া সম্ভব নয়।

আমাদের দেশে পুলিশি ব্যবস্থায় সংস্কার দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষমান। পুলিশি আইনে যথাযথ পরিবর্তন না আনলে তদন্তকারী সংস্থাগুলি উপযুক্ত আইনি সহায়তা থেকে বঞ্চিতই থেকে যাবে। গৃহমন্ত্রক নিজেই এই খামতির কথা 'Status note on Police Reforms in India'-তে ব্যক্ত করেছে। একটি সর্বার্থে স্বাধীন ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত সর্বোচ্চ তদন্তকারী সংস্থার গঠনের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় বহুবিধ বিষয় আদালতের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করলেও মানুষ কিন্তু এখনও আদালতের ওপরই শেষ ভরসা রাখে। এর একমাত্র কারণ আদালতের নিজস্ব স্বাধীন অস্তিত্ব, সংবিধানের প্রতি পূর্ণ দায়বদ্ধতা এবং তাদের কাজ করার নির্দিষ্ট আইনি গণ্ডির ব্যবস্থা।

এই সূত্রেই এক ছাতার তলায় আনা প্রয়োজন ইডি, সিবিআই, এসএফআইও প্রভৃতিকে। এদের নিজস্ব একটি আচার সংহিতা থাকবে যেখানে নির্দিষ্ট ও প্রাঞ্জলভাবে বলা থাকবে সংস্থাগুলির ক্ষমতা, কাজের পদ্ধতি ও কাজের গণ্ডি। বলা বাহুল্য এই সংস্থার মাথায় থাকবে একজন স্বাধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ও নিরপেক্ষ কর্তা যাঁকে নিয়োগ করবে সিবিআই কর্তা নিয়োগের সমচরিত্রের উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কোনো কমিটি। তাঁকে সাহায্য করার জন্য বেশ কিছু সহকারী থাকবেন যাঁরা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে হবেন বিশেষজ্ঞ। একই ছাতার তলায় আনার ফলে বর্তমানে নানা বিষয়ে লিপ্ত মূলত একই প্রকৃতির বহু সংস্থার প্রয়োজন হবে না। আজকের দিনে একটি ঘটনা ঘটলে নানাবিধ সংস্থা তদন্ত করে থাকে যার অভিমুখ একই। এর ফলে সাক্ষীদের আনয়ন ও বয়ানে স্ববিরোধিতা, প্রমাণ ফিকে হয়ে যাওয়া ও সন্দেহভাজন অপরাধীর দীর্ঘকারাবাস এড়ানো যাবে। শুধু তাই নয় সংস্থার হয়রানি করার বদনামও বহুলাংশে ঘুচবে। কোনো অপরাধমূলক ঘটনা ঘটলেই সংস্থা ঠিক করে নেবে তাদের তরফে কোন বিশেষজ্ঞ বিভাগ সেটির দেখভাল করবে। সংস্থার প্রধানের তরফে কাজকর্মের সফলতা ব্যর্থতা নিয়ে সর্বোচ্চ ব্যক্তি বাৎসরিক অডিট করবেন তাহলে পর্যাপ্ত check & balance থাকবে।

প্রতিনিয়ত knowledge upgradation, সর্বাধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংস্থার পারস্পরিক জ্ঞানের ও প্রশিক্ষণের আদান প্রদানের অবকাশ থাকবে যাতে সেরা উদ্ভাবকগুলি জানা যায়। পুলিশ ও রাজ্যে ঘটা অপরাধের সিংহভাগ যেখানে রাজ্যের আওতায় পড়ে সেখানে তদন্তের প্রাথমিক দায়িত্ব রাজ্য পুলিশের অধীনে থাকে। কেন্দ্রীয়ভাবে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সংস্থা থাকলে রাজ্যগুলিও সেই পথ অনুসরণ করে তদের ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে পারে। এতে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতাও বাড়বে।

পরিশেষে বলব রাজনৈতিক নির্দেশদাতারা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতাসীন হয়ে বদলে যাবে। কিন্তু আপনাদের সংস্থাগুলি চিরস্থায়ী। তাই স্বাধীনতার সঙ্গে আপোশ নয়। সার্ভিসের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে আপনার অন্য সহযোগীরাই আপনার শক্তি।

(লেখক সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি)

শোকসংবাদ

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মাদপুর খণ্ডের পাইসিতি শাখার মুখ্যশিক্ষক অংশুমান সাঁতরার পিতৃদেব বিদ্যুৎ সাঁতরা গত ৩০ মার্চ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৫ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ২ পুত্র ও ১ কন্যা রেখে গেছেন।

রাজ্য হজ কমিটির মুসলমান আমলা বানানোর ছক

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য হজ কমিটির একটি বিজ্ঞাপন নজরে এসেছে যাতে বলা হয়েছে বিনামূল্যে ঘরে বসে ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস প্রশিক্ষণের জন্য যারা ভর্তির পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক, তারা অমুক তারিখের মধ্যে যোগাযোগ করুন ইত্যাদি। হজ কমিটির এক আধিকারিক বলেছেন, এই প্রথম আমরা এই ধরনের পাঠক্রম শুরু করলাম। বাড়িতে বসেই সিভিল সার্ভিসের ভর্তির পরীক্ষায় যারা অংশগ্রহণ করতে চান, তারা এই সুযোগ পাবেন। আমাদের কাছে খবর, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ও এই ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে, সেখান ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের সঙ্গে আইএএস পাঠক্রমের ব্যবস্থাও রয়েছে।

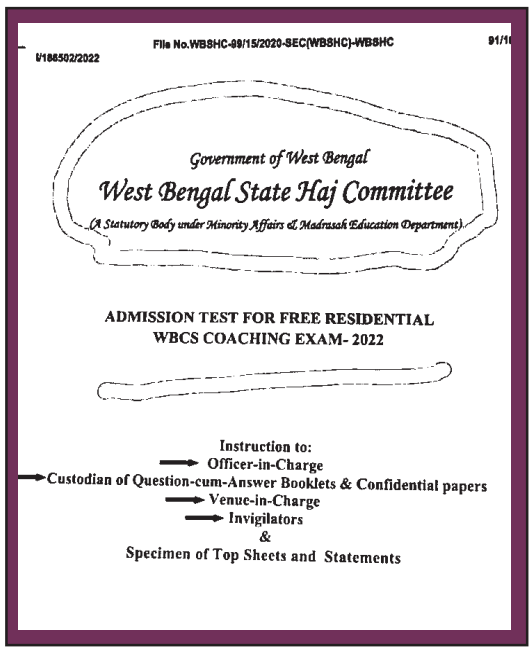
File No.WBSHC-69/15/2020-SEC(WBSHC)-WBSHC

Government of West Bengal

West Bengal State Haj Committee

(A Statutory Body under Minority Affairs & Madrasah Education Department)

ADMISSION TEST FOR FREE RESIDENTIAL
WBCS COACHING EXAM- 2022

Instruction to:
Officer-in-Charge
Custodian of Question-cum-Answer Booklets & Confidential papers
Venue-in-Charge
Invigilators
&
Specimen of Top Sheets and Statements

বলা বাহুল্য, এই পাঠক্রমের সুযোগ কেবলমাত্র একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষই পাবেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, এতে বলার কী আছে? কেউ বলতেই পারেন, তথাকথিত সংখ্যালঘুদের এতকাল কেবল রাজনীতির বোড়ে হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, এবার তাদের না হয় প্রকৃত উন্নতি হবে। কিন্তু বাঙ্গালি হিন্দুরা ঘরপোড়া গোরু, সিঁদুরে মেঘ দেখলে তারা ডরাবেই।

মুসলমানদের মধ্যে এই আমলা তৈরির প্রবণতাটা একেবারে হালফিলের ঘটনা। ৪৭-এ যখন লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান হলো, কিন্তু হাসকে হাসকে হিন্দুস্তান দখল করার জন্য তারপর থেকেই তারা সচেষ্ট। বিশেষ করে ৪৭-এ তারা পুরো বাঙ্গলা প্রায় দখল করে ফেলেছিল, যদি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় না রুখে দাঁড়াতেন সেই সময় আজকের পশ্চিমবঙ্গও নিশ্চিতভাবেই পূর্ব পাকিস্তানের অঙ্গ হতো। তারপর থেকে ইসলামিক দেশ বাংলাস্তান গড়ে তোলার জন্য মোল্লাবাদীরা কম সচেষ্ট হয়নি। তাতে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে পশ্চিমবঙ্গকেও যুক্ত করার পরিকল্পনা ছিল। আমরা জানি, লাভ জেহাদের মাধ্যমে হিন্দু মহিলাদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করে ভারত বিরোধী কাজে তাদের ব্যবহার করার পরিকল্পনাও ছিল। প্রথমে কেরলে, এখন উত্তরপ্রদেশে এই কাজে মোল্লাবাদীরা যথেষ্ট সাফল্য পেয়েছে। সুতরাং রাজ্যে আমলা তৈরিতে তাদের এই উদ্যোগ ভবিষ্যতে হিন্দুদের বিপদে ফেলার কোনও ছক কিনা, তা নিয়ে ভাবার যথেষ্ট কারণ আছে।

মাদ্রাসায় তথাকথিত সংখ্যালঘুদের যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তার লক্ষ্য যে ভারত-বিরোধী কাজে তাকে ব্যবহার করা, তা সবাই জানেন। এই শতকের গোড়ায় এরাজ্যের বাম সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মাদ্রাসায় জেহাদি শিক্ষা দেওয়া হয় বলে ঘরেবাইরে তীব্র সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছিলেন।

সেই রাজনীতির চরিত্র আজও একইরকম আছে ঠিকই। কিন্তু যে চতুর কৌশলে সিপিএম মুসলমান তোষণ করতো, বর্তমান শাসকদল একই পন্থায় মুসলমান তোষণ করলেও, সিপিএমের মতো একাজে তাদের সুচতুরতার কৌশলের অভাবে একপ্রকার বেআব্রু হয়ে গেছে তাদের তোষণ নীতি। রাজ্যে হিন্দু জাগরণ ঘটেছে। এই পরিস্থিতিতে দেশবিরোধী যে কোনো চক্রান্ত করা রাজ্যের জনগণের চোখে ধরা পড়বে। সম্ভবত, এই মনোভাব থেকেই রাজ্যে রাজ্যে আমলা তৈরির নয়া কৌশল নেওয়া হলো রীতিমতো সরকারি মদতে। কারণ তাতে প্রশাসনিক দখল তাদের হাতে আসবে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জানেন, রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চল মালদা, মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মুসলমান বহুল এলাকায় সচরাচর মুসলমান আমলা নিয়োগ করা হয় এবং এই জেলাগুলিতে অপরাধপ্রবণতা যে বেশি এবং হিন্দুরা এখানে তিষ্টতে পারে না, একথাও সবার জানা। তাই দেশের প্রশাসনিক দখল নিতে পারলে অপরাধ করেও রেহাই পাওয়া যাবে, এই ধরনের কথা বলে মুসলমান যুবকদের যদি মগজ ধোলাইয়ের চেষ্টা হয় তাহলেও আশ্চর্যের কিছু নেই। এক্ষেত্রে পুলিশে জানিয়েও কোনো লাভ হবে না, কারণ গোটা কর্মসূচিটাই সরকার অনুমোদিত। আর ভারতের সংবিধান মোতাবেক এতে কোনোভাবে বাধাও দেওয়া যাবে না।

ফলে এ রাজ্যের হিন্দুদের অবস্থা আগামীদিনে আরও খারাপ হতে পারে। যাতে তা না হয়, সে ব্যাপারে সচেতনতা প্রয়োজন। ঘরপোড়া গোরুদের কাছে সিঁদুরে মেঘের বার্তা সর্বাগ্রেই পৌঁছায়। □

ঔষধের মূল্যবৃদ্ধি : তথ্য, সত্য, অর্ধসত্য ও ভারতবর্ষ

দেবযানী ভট্টাচার্য

ওষুধের মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে লিখছেন অনেকেই। কিন্তু এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লেখাগুলি যেমন তথ্যমূলক ও সত্যনিষ্ঠ হওয়া উচিত ছিল, তেমন নয়। যতগুলি চোখে পড়ল, সবই ভাসাভাসা ও প্রচারমূলক। মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে কোন ওষুধগুলির, কেন হচ্ছে এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়াস কেউ করেননি। কিন্তু বিষয়টি যেহেতু মানুষের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তাই এ বিষয়ে প্রচার অপেক্ষা প্রকৃত তথ্যের প্রয়োজন বেশি। সবচেয়ে বড়ো কথা, যে ওষুধগুলির দাম বাড়ছে, সেগুলির দাম কেন বাড়ছে, কতখানি বাড়ছে এবং সেই মতো মূল্যবৃদ্ধির সম্মতি যদি ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটিকে (এনপিপিএ) না দিত ভারত সরকার তাহলে কী হতে পারত, সাধারণ মানুষের সেসব জানা প্রয়োজন।

দাম বাড়তে চলেছে ন্যাশনাল লিস্ট অব এমার্জেন্সি মেডিসিন বা এনএলইএম-এর অন্তর্ভুক্ত ওষুধগুলির। এর মধ্যে পড়বে ব্যথা কমানোর ওষুধ, সংক্রমণ কমানোর ওষুধ, জ্বর কমানোর ওষুধ, রক্তাল্পতা কমানোর ওষুধ, ভিটামিন ও মিনারেল প্রিপারেশনস, কোভিডের চিকিৎসায় ব্যবহৃত আরও কিছু ওষুধ, কিছু স্টেরয়েড প্রডাক্ট এবং আরও অন্যান্য ওষুধ। এনএলইএম-এ অন্তর্ভুক্ত ওষুধের মোট সংখ্যা এই মুহূর্তে ৮৮৬টি। তবে প্রশ্ন এ-ও আছে যে এইসব ওষুধের দাম কি আগে কখনও বাড়েনি? এই কি প্রথম বাড়তে চলেছে? উত্তর হলো, নিয়ন্ত্রিত মূল্যের এইসব শেডিউলড্ ওষুধের দাম প্রতিবছরই নিয়মমাফিক সংশোধন করে ভারত সরকার এবং প্রতি বছরই এইসব ওষুধের মূল্যের কিছু না কিছু পরিবর্তন হয়ে থাকে দেশের হোলসেল প্রাইস ইনডেক্স অনুযায়ী। বিষয়টি অস্বাভাবিক কিছু নয়। ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি (এনপিপিএ)-র তথ্য অনুযায়ী গত বছরও দাম বেড়েছিল ৫ শতাংশ। তবে এবছরের বিশেষত্বটি হলো, এবছর এপ্রিল মাস থেকে কন্ট্রোলড প্রাইসে শেডিউলড ওষুধগুলির দাম বাড়তে চলেছে ১০ শতাংশ এবং এইটিই শেডিউলড ওষুধের মূল্য বৃদ্ধির সরকার নির্দিষ্ট সর্বাধিক হার। এর বেশি হারে এইসব ওষুধের দাম বাড়ানোর প্রভিশন আইনেই নেই। অর্থাৎ যতখানি দাম বাড়ানো সম্ভব ছিল ততখানিই দাম সরকার এবছর বাড়িয়েছে। তাই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এতখানি মরিয়া হয়ে সরকার সর্বাধিক হারে দাম বাড়াতে গেল কেন? আম্বানি আদানিদের সুবিধে করে দেওয়ার জন্য? সত্যনিষ্ঠ উত্তর চাইলে জানতে হবে বেশ কিছু তথ্য।

ভারতকে বলা হচ্ছে পৃথিবীর ফার্মেসি অর্থাৎ বিভিন্ন ওষুধের নানা ডোসেজ ফর্ম যেমন ট্যাবলেট, ক্যাপসুল, লিকুইডস, ইঞ্জেকশন, এরোসল ইত্যাদি এদেশে তৈরি হয় প্রচুর পরিমাণে এবং ভারতে তৈরি ফর্মুলেশন এক্সপোর্ট হয় সর্বত্র। কিছু উদাহরণ দিলে বিষয়টি হয়তো আরও খানিকটা স্পষ্ট হবে। কোভিড প্যান্ডেমিকের ফার্স্ট ফেজে ভারত জীবনদায়ী ওষুধ এবং মেডিক্যাল ইক্যুইপমেন্টস সরবরাহ করেছে ১৫০টিরও বেশি দেশকে। তাছাড়া, এবছরের ২৮ মার্চ পর্যন্ত মোট ৯৮টা দেশকে ভারত সরবরাহ করেছে দেশে প্রস্তুত কোভিড ভ্যাকসিনের মোট ১৭ কোটি ৪ লক্ষ ৪৬ হাজার ৪০০টি ডোজ। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনে ক্রমাগত পাঠিয়েছে ও পাঠাচ্ছে জীবনদায়ী ওষুধ-সহ অন্যান্য নানা ওষুধ এবং তালিবানের খপ্পরে পড়ে যাওয়া আফগানিস্তানেও এ যাবৎ পাঠিয়েছে ৬.৬ টন জীবনদায়ী ওষুধ। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখেছিলেন, 'সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি'। রানি, কারণ ভারতবর্ষ 'মা'। সকলের প্রতি এদেশের মমতা ও মানবিক অনুভূতি তাই প্রশ্নাতীত। কিন্তু অনুভূতি থাকা যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন সামর্থ্যের। সে সামর্থ্য অর্জনে ভারতের নিরলস প্রয়াসে ঘাটতি নেই। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগের ফলে ভারতে ওষুধের নানা ফর্মুলেশনের প্রডাকশন ও এক্সপোর্ট দুই-ই বেড়েছে অনেক বেশি। এবার প্রশ্ন হলো, এতকিছু ভালো যদি হয়েই থাকে, তাহলে অভ্যন্তরীণ বাজারে সরকারকে শেডিউলড ওষুধের দাম বাড়াতে হচ্ছে কেন? তবে কি দেশের লোককে শোষণ করে বিদেশের কাছে ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে চাইছে ভারত? যাকে বলে— 'ঘর জ্বালানি পর ভুলানি'? তথ্যনিষ্ঠ উত্তর প্রয়োজন।

ফর্মুলেশন অর্থাৎ ট্যাবলেট, ক্যাপসুল, ইঞ্জেকশন আদি ডোসেজ ফর্ম তৈরি করতে ওষুধের যে মূল উপাদান (যাকে বলা হয় বাল্ক ড্রাগ/এপিআই অর্থাৎ অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিন্ট) প্রয়োজন হয়, সেই জৈব রাসায়নিক পদার্থগুলির প্রায় ৭০ শতাংশই ভারতে তৈরি হয় না, বরং এপিআই ভারতকে আমদানি করতে হয় বিদেশ থেকে যার একটি বড়ো অংশই আবার আমদানিকৃত হয় চীন থেকে। কোভিড প্যান্ডেমিকের কারণে

দেশের ৫০ কোটি মানুষের জন্য যে আয়ুষ্মান ভারত বিমার সুবিধা ভারত সরকার তৈরি করেছে, সেই সুবিধা সমস্ত ভারতবাসীর জন্য নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। স্বেচ্ছায় সেই বিমার আওতা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতাও যেমন সব মানুষকে দিয়ে রাখা উচিত, তেমন বিমার আওতায় দেশের ১০০ শতাংশ মানুষকে নিয়ে আসার কাজটিও করা দরকার।

গত দু'বছরে এইসব এপিআই-এর দাম চীন তথা অন্যান্য উৎপাদক দেশগুলি বাড়িয়েছে ১৫ থেকে ১৩০ শতাংশ পর্যন্ত। প্যারাসিটামলের এপিআই প্যারা অ্যামাইনো অ্যাসেটাইল স্যালিসাইলিক অ্যাসিডের দাম বেড়েছে ১৩০ শতাংশ। অনুরূপভাবে, ওষুধের ফর্মুলেশন ম্যানুফ্যাকচারিং-এ এপিআই ছাড়া আর যা কিছু লাগে, (যাকে বলে এক্সিপিয়েন্টস) সেগুলিরও মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে ১৮ থেকে ২৬২ শতাংশ। যেমন, গ্লিসারিন ও প্রপিলিন গ্লাইকল হলো এমন দুই সলভেন্ট (দ্রাবক) যেগুলি বিভিন্ন ওষুধের লিকুইড ফর্মুলেশন ম্যানুফ্যাকচারিঙে ব্যবহৃত হয়। প্যান্ডেমিকের গত দু' বছরে গ্লিসারিনের দাম বেড়েছে ২৬৩ শতাংশ আর আর প্রপিলিন গ্লাইকলের ৮৩ শতাংশ। তাছাড়া, এপিআই থেকে ফর্মুলেশন তৈরির গোটা পদ্ধতিটিতে তৈরি হয় এমন বহু ইন্টারমিডিয়েট প্রডাক্ট যেগুলিও এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ওষুধ। গত দু'বছরে ১১ থেকে ১৭৫ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে এই ধরনের ইন্টারমিডিয়েট প্রডাক্টগুলিরও। যেমন, পেনিসিলিন জি একটি ইন্টারমিডিয়েট প্রডাক্ট যেটির মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে ১৭৫ শতাংশ এবং এটি একটি অ্যান্টিবায়োটিক যা সংক্রমণ কমানোর জন্য ব্যবহৃত হয় মূলত ইঞ্জেকশন হিসেবে। এই দ্রব্যগুলি ভারত দেশে উৎপাদন করে না বরং নিয়ে আসে আমদানি করে। প্যান্ডেমিকের কারণে উদ্ভূত অতিরিক্ত চাহিদার ফলে এবং প্যান্ডেমিক চলাকালীন লকডাউনের কারণে চাহিদার তুলনায় উৎপাদনের গতি হ্রাস পাওয়ায় এই সমস্ত এপিআই, এক্সিপিয়েন্টস এবং ইন্টারমিডিয়েট প্রস্তুতকারক দেশগুলি এসবের দাম দিয়েছে অনেকখানি বাড়িয়ে। অতএব সেই কারণেই সেইগুলির ব্যবহারে তৈরি এন্ড প্রডাক্ট অর্থাৎ ওষুধের ফর্মুলেশনগুলির দাম না বাড়িয়ে এই মুহূর্তে ভারতের আর কোনো উপায় নেই। ওষুধের মূল্যবৃদ্ধির প্রকৃত কারণ এটাই। মূল্যবৃদ্ধি মানুষের পক্ষে বিড়ম্বনার হলেও এ বিষয়ে প্রকৃত বিপদটি ছিল এই যে, এতদ্সত্ত্বেও যদি দাম না বাড়ানোর গা জোয়ারি সিদ্ধান্ত ভারত সরকার নিত, তবে নিত্যপ্রয়োজনীয় ওষুধের জোগানে প্রথমত, দেখা দিত ঘাটতি এবং দ্বিতীয়ত দেখা দিত জাল ওষুধের রমরমা। এপিআই-এর দাম বাড়ার ফলে ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলির উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছিল আগে থেকেই। কিন্তু ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণে ও অনুরোধে গত দু' বছর যাবৎ শেডিউলড ওষুধগুলির দাম উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির অনুপাতে বাড়াতে তারা পারেনি। এমত চাপ স্বীকার করে প্যান্ডেমিকের দু' বছর টানার পর আরও টানতে নিশ্চিতভাবেই রাজি হতো না ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি ফলে বাজার দখল করত জাল ওষুধ। আন্দাজ করা যায় যে ভারতের শাসনভার যদি এই সময়ে কংগ্রেসের হাতে থাকত, তবে জনমোহিনী নীতি নিয়ে তারা হয়তো রাজি হতো না ওষুধের দাম বাড়াতে, কিন্তু তার দ্বারা আদতে পরোক্ষে উৎসাহ দেওয়া হতো জাল ওষুধওয়ালাদের এবং বাড়ত ওষুধের ব্যবহারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু মানুষের দুর্নীতির সুযোগ। কংগ্রেস আমলে এভাবেই সর্বক্ষেত্রে তৈরি হয়েছিল দুর্নীতিপরায়ণতা এবং একদল সুবিধাভোগী গোষ্ঠী। বর্তমান ভারত সরকার সেটি ঠেকাতে চাইছে বলেই হয়তো এদের উপর বেশি পরিমাণে আসছে অর্ধসত্যপ্রচারের আঘাত। তবে স্বাধীনোত্তরকালে এতবছর কাটার পরেও কেন প্রয়োজনীয় বাল্ক ড্রাগ ম্যানুফ্যাকচারিঙে উপযুক্ত উদ্যোগ ভারত সরকার এযাবৎ নেয়নি সে প্রশ্ন সঙ্গত এবং সে প্রশ্নের কোনো সদুত্তর বোধ করি নেই। তবে বর্তমান ভারত সরকার যে পথে এগোচ্ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে ফার্মা দুনিয়া যে ভারতের কথা শুনে চলবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। গুজরাটের জামনগরে ভারত সরকারের আয়ুশ মন্ত্রকের উদ্যোগে তৈরি হতে চলেছে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের (হু) ট্রাডিশনাল মেডিসিনের গ্লোবাল সেন্টার। ভারত সরকার এবং ডব্লুউ এইচ ও (হু) উভয়ের তরফ থেকেই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সে ঘোষণা করা হয়ে গিয়েছে।

এপ্রিল মাস থেকে দাম বাড়তে চলেছে প্রায় ৮৮৬টি ওষুধের। এর মধ্যে আছে জ্বর ও ব্যথা কমানোর ওষুধ প্যারাসিটামল এবং আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক সংক্রমণের (সহজ ভাষায় সর্দি, কাশি গলা ব্যথা, কান ব্যথা, টনসিলাইটিস জাতীয় লক্ষণসমূহ) চিকিৎসায় ব্যবহৃত অ্যাজিথ্রোমাইসিনের। তাছাড়াও বাড়বে সিপ্রোফ্লক্সাসিন, মেট্রোনিডাজোলের মতো অ্যান্টিবায়োটিক এবং ফেনোবারবিটোন ও ফেনিটয়েনের মতো এপিলেপ্সির ওষুধের দামও। বস্তুত, নিয়ন্ত্রিত মূল্যের এই ওষুধগুলি দখল করে রয়েছে ভারতে ওষুধের ১.৫ ট্রিলিয়ন মূল্যের খুচরো বাজারের প্রায় ১৬ থেকে ১৮ শতাংশ। এগুলির দাম বাড়তে চলেছে ১০ শতাংশ। এর প্রকৃত অর্থ হলো--- প্যারাসিটামল ট্যাবলেট বানানোর র মেটিরিয়ালের (এপিআই) দাম যেখানে গত দু' বছরে বেড়েছে ১৩০ শতাংশ, সেখানে দু' বছর পর প্যারাসিটামল ট্যাবলেটের দাম বাড়তে চলেছে ১০ শতাংশ। অর্থাৎ এযাবৎ যে ১৫টি প্যারাসিটামল ট্যাবলেট পাওয়া যেত ২০ টাকায়, সেই ১৫টি ট্যাবলেট এখন পাওয়া যাবে ২২ টাকায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, দাম না বাড়ালে কমে যেতে চলেছিল প্যারাসিটামলের জোগান এবং সেই শূন্যস্থান জাল ওষুধ নিয়ে দখল করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল কিছু অসাধু ব্যবসায়ী। এমত প্রকৃত বিপদ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষকে অবগত না করানোর অর্ধসত্যকথন প্রক্রিয়াটি ভুল শুধু নয়, একটি হোয়াইট কলার অপরাধ বললে ভুল বলা হয় না। এ রাজ্যের সংবাদমাধ্যমগুলি এমত অর্ধসত্যকথনে ক্লান্তিহীন।

শেষ করার আগে একথা বলা প্রয়োজন যে চিকিৎসা ক্ষেত্রটিকে সার্বিকভাবে জনস্বাস্থ্যবিমার অধীনে নিয়ে না আসা পর্যন্ত মধ্যবিত্তের ভোগান্তি কমবে না এবং তার জন্য প্রয়োজন জনমত গঠন। দেশের ৫০ কোটি মানুষের জন্য যে আয়ুষ্মান ভারত বিমার সুবিধা ভারত সরকার তৈরি করেছে, সেই সুবিধা সমস্ত ভারতবাসীর জন্য নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। স্বেচ্ছায় সেই বিমার আওতা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতাও যেমন সব মানুষকে দিয়ে রাখা উচিত, তেমন বিমার আওতায় দেশের ১০০ শতাংশ মানুষকে নিয়ে আসার কাজটিও করা দরকার। তবে এমত আশা রাখা যায় দেশের বর্তমান সরকারের ওপরেই। পূর্ববর্তী সরকার ভারতকে এবং ভারতের মানুষকে আত্মনির্ভর করে তোলার কার্যকরী ও যথাসাধ্য প্রয়াস এযাবৎ করেনি বলেই তাদের ওপর ভরসা করা চলে না।

(লেখিকা ফার্মাসিউটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার)

ভারতে ক্রিপ্টোকারেন্সির কোনও দরকার আছে কি?

শেখর সেনগুপ্ত

সম্প্রতি মিনিস্টার অব স্টেট ফর ফিনান্স মি: পঙ্কজ চৌধুরী রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে বললেন, 'এই মুহূর্তে ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ে তেমন মাথা ঘামানোটা অনাবশ্যক। রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়াও এই কারেন্সিকে বাস্তবায়িত করবার কথা ভাবেছে না।'

আজ না ভাবলেও অদূর ভবিষ্যতে এই কারেন্সির গুরুত্ব ভারতে বাড়বে। কারণ ক্রিপ্টোকারেন্সি যদি চালু হয়, তাহলে cash transaction-এ যে ব্যয় তার হাত থেকে সরকার অনেকটাই রেহাই পাবেন। উদাহরণস্বরূপ জানাচ্ছি, ২০২০-২১ অর্থ বছরে সরকারকে কেবল নোট ছাপাতে ও খুচরো পয়সা তৈরি করতেই খরচ করতে হয়েছে ৪ হাজার ১২ কোটি টাকা। ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবস্থা চালু হলে এই ব্যয়ভার বিপুলভাবে হ্রাস পাবে এবং শেয়ারবাজারেও লেনদেন হয়ে উঠবে সহজতর। কারণ ক্রিপ্টো হলো ডিজিটাল কারেন্সি। হাতে গরম টাকা নয়, কিন্তু টাকার যা ভূমিকা তা পালন করে যাবে। অর্থনীতির ব্যাখ্যায় এই কথাগুলিই বলা হয়েছে জোরের সঙ্গে : A Cryptocurrency is a medium of exchange, such as the Rupee or the US dollar, but is digital in format and uses encryption techniques to both control the creation of moneytory units and to verify the exchange of money.

এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো বিটকয়েন। কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ছাড়া এর কার্যকারিতা আমরা পেতে পারি না। ক্রিপ্টোকারেন্সি পেপার নোট নয়, ধাতব মুদ্রাও নয়। এর তাবৎ লেন-দেন হবে অনলাইনে। আমি কত টাকার মালিক, তার রেকর্ড থাকবে ডিজিটাল লেজারে— অর্থাৎ তা হবে computerized database.

ক্রিপ্টোকারেন্সির কোনও বস্তুগত চেহারা নেই। কাগজে ছাপা টাকার মতো (paper money) এবং কোনও কেন্দ্রীয় সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাজারে ছাড়া হবে না। কিন্তু এই কারেন্সির ওপর থাকবে Decentralised control এবং অবশ্যই Ledger technology বহাল রাখা হবে।

আগেই বলেছি, ক্রিপ্টো কয়েনের আবির্ভাব বিট কয়েন থেকে। ১৯৮৩ সালে আমেরিকান কিপ্টোগ্রাফার ডেভিড চৌন প্রথম ক্রিপ্টোগ্রাফিক ইলেকট্রনিক টাকা লেন-দেন করা যায় কিনা, তা নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেন এবং ১৯৯৫ সালে তিনি তা বাস্তবায়িত করেন। ডিজিটাল কারেন্সি যদিও ব্যাংক-ই ইস্যু করবে, কিন্তু এর ট্রানজাকসান সেই ব্যাংকের নজরদারির আওতায় থাকছে না। ১৯৯৬ সালে ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করে, যার নাম 'How to make mint.' অর্থাৎ অর্থ/টাকা চালুর সম্ভাব্য নবপন্থা কী হতে পারে— সেই সম্পর্কে উৎসুক নাগরিকদের অবহিত করা। বলা হয়েছে 'বি. মানি' চালু হতে পারে কোন পন্থায়। সেই টাকা হবে anonymous অর্থাৎ বেনামি— যার চরিত্র তথা কার্যধারা হবে ইলেকট্রনিক ক্যাশ সিস্টেম।

২০০৯ সালে এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয়। ২০১১ সালে দেখা গেল, এর Internet Censorship বেশ জটিল। তবুও পরীক্ষার্থে ২০১১-এর অক্টোবরে Litcoin-কে release করা হয়। এই ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নেয় ইউনাইটেড কিংডম অর্থাৎ গ্রেটব্রিটেন। ২০১৪ সালের ৬ আগস্ট ওই দেশ জানায়, 'Our Country's Treasury had Commissioned a study of Crypto currencies which may gradally play, an important role in UK economy.

ঘোষিত হলেও ব্রিটেনে এখনও বিষয়টা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা অব্যাহত। আদতে ক্রিপ্টোকারেন্সিকে কোনও দেশের চালু লেন-দেনে আনতে গেলে ৫টি শর্ত/ব্যবস্থাপনাকে মান্যতা দিতে হবে। সেই শর্তগুলি নিম্নরূপ : ১. এই আর্থিক লেনদেনকে নিয়ন্ত্রণ করতে কোনও কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিষ্প্রয়োজন; এই কাজ চলবে পারস্পরিক মত ও স্বীকৃতির ঐক্যানুসারে। ২. তবে ক্রিপ্টোকারেন্সির ব্যবস্থাপনা ঠিক ঠিক কার্যকর থাকছে কিনা, সেই বিষয়ে নজর রাখা হবে। ৩. এই ব্যবস্থা চালু করবার আগে পরীক্ষা করে দেখতে হবে, সংশ্লিষ্ট দেশে এই ব্যবস্থাকে কার্যকর করবার মতো পরিকাঠামো আছে কিনা, কতগুলি Cryptocurrency Units-কে সক্রিয় রাখবার জন্য দক্ষ ও কার্যকর ব্যবস্থাপনা তৈরি করা গেল কী না। ৪. Cryptocurrency Unit পরিচালনা করবার মতো প্রশিক্ষিত ব্যক্তি বা সংস্থাকে প্রস্তুত রাখতে হবে; তাঁদের কাজ হবে নিখুঁত ও ধারাবাহিক। ৫. প্রয়োজন মোতাবেক ইউনিটের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

মার্চ, ২০১৮, Cryptocurrency অভিধাটি স্থান লাভ করে Merriom—Webster Dictionary-তে। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো Cryptocurrency লেনদেন সম্পর্কে আপামর জনতাকে অবহিত করা, প্রশিক্ষিত করা।

Cryptocurrency's Coins নির্মাণ ও মজুত রাখতে চালু হবে ব্লক কয়েন. এই ব্লক কয়েনে থাকবে সকল লেন-দেনের রেকর্ড। সেখানে কোনও ডাটাকে বদলানো যাবে না। এটা হবে An open, distributed ledger. তাই ব্লক কয়েনের ডিজাইন কেমন হবে, তা নিয়ে গবেষণার অবকাশ রয়েছে।

ইংরেজিতে আমরা Node বলতে বুঝি, যে কোনও বস্তুর সেই অংশ যেখান থেকে সেই বস্তু বা যন্ত্রের অন্যান্য অংশগুলি বেরিয়ে এসে কাজ করে থাকে। ক্রিপ্টোকারেন্সির সেই Node হলো কম্পিউটার। অর্থাৎ কম্পিউটার মাধ্যমেই ক্রিপ্টোকারেন্সির সকল কর্ম সাধিত হয়ে থাকে। ক্রিপ্টোকারেন্সির বৈশিষ্ট্যকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেশের অর্থদপ্তর যা জানাচ্ছে, আমি এখানে তা তুলে ধরলাম। এর মুখ্য গুরুত্ব ও কার্যকারিতা সম্পূর্ণরূপেই কম্পিউটারের ওপর নির্ভরশীল :

The node supports the relevant cryptocurrency's network through either; relaying transactions, validation or hosting a copy of the blaok chain.

In terms of relaying transactions each network computer (node) has a copy of the block chain of the crypto currency it supports, when a transaction the node creating the transaction broadcasts details of the transaction using encryption to other nodes throughout the node network so that the transaction is known.

ক্রিপ্টোকারেন্সির বিবিধ স্কিম রয়েছে তাদের লেন-দেনকে নির্ভুল প্রমাণ করবার জন্য। দেশে যখন ক্রিপ্টোকারেন্সি চালু হবে, তখন ওইগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে হবে। এই রকম নেটওয়ার্কের অন্যতম হলো Mining. — যা Validation of transaction-কে চিনিয়ে দেবে। আর একটি বিষয় হলো wallet. এই wallet-এর ভূমিকাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে :

A cryptocurrency wallet stores the public and private 'keys' (addresses) or seed which can be used to receive or spend the crypto currency. With the public key, it is possible for others to send currency to the wallet.

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রথম দিকে চালু থাকবে ব্যাংকিং ও সরকারি অফিসের বাইরে। কাজ হবে শুধু ইন্টারনেটে। আর্থিক লেনদেনে ব্যয়ের মাত্রা অবশ্যই কমবে। Transaction fee হবে অতি সামান্য। বিশ্বের যে সমস্ত দেশে প্রচলিত আর্থিক লেন-দেনের সঙ্গে ক্রিপ্টোপদ্ধতিও চালু হয়েছে বা হতে চলেছে অন্তত আংশিকভাবে, এখানে তাদের সম্পর্কে জানাবার চেষ্টা করছি :

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

২০২১ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ১৭টি রাজ্যে ক্রিপ্টো কারেন্সির লেন-দেন আইনসিদ্ধ হয়েছে চিরাচরিত প্রথার পাশাপাশি। যুক্তরাষ্ট্রের Senate Banking Committee-র কার্যকরী সদস্যদের একজন সেনেটার এলিজাবেথ ওয়ারেন সরাসরি দেশের বিত্তমন্ত্রীকে চিঠি লিখে জানালেন, 'ক্রিপ্টো কারেন্সি সম্পর্কে নাগরিকদের পূর্ণ অবহিত না করেই যদি এই ব্যবস্থাকে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা চলে, তাহলে বৃহৎ বিপর্যয় দেখা দিতেই পারে।' তারপর দেশের Cryptocurrency Enforcement Team, U.S.A.-এর ডাইরেক্টর ইউন ইয়াং চোই চতুর্দিকে বিষয়টাকে বোঝাবার কাজে নেমে পড়েছেন। তাঁর কাজই হলো, To teach the citizens first the method of identification of and dealing with misuse of Cryptocurrencies and other digital assets.

চীন : সেপ্টেম্বর ২০২১, চৈনিক সরকার ঘোষণা করে যে, অতঃপর তাদের দেশের কোনও প্রকার লেন-দেনেই ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহৃত হবে না।

ইংল্যান্ড : ১০ জানুয়ারি ২০২১ ব্রিটিশ সরকারের অর্থদপ্তর একটি নোটিশে জানিয়ে দেয় যে, অতঃপর ইউ কে মার্কেটে ক্রিপ্টোকারেন্সি তাঁরাই লেন-দেনে ব্যবহার করতে পারবেন, যাঁরা দেশের ফিনান্সিয়াল কনডাক্ট অথরিটি-র অনুমতি পেয়েছেন। এরপর ২৭ জুন, ২০২১ জানিয়ে দেয়, বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি এদেশি Binance ইংল্যান্ডে ওই ব্যবস্থায় কোনও অংশই নিতে পারবে না।

দক্ষিণ আফ্রিকা : দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিপ্টোকারেন্সি গ্রহণ করেছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল, এই ব্যবস্থা ঠকবাজদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে। এই দেশে এই বিষয়ে সবচেয়ে বড়ো কেলেঙ্কারি হয় এপ্রিল, ২০২১ সালে— সেই ঘটনা সম্পর্কে ওখানকারই সরকারি রিপোর্টকে আমি এখানে তুলে ধরছি : ...Two founders of an Africabased Cryptocurrency exchange called 'Africrypt', Raees Cajee and Ameer Cajee, disappeared with $ 3.8 billion worth of Bitcoin. Additionally Mirror Trading International disappeared with $ 170 billion worth of Cryptocurrency in Janaury, 2021.'

তুরস্ক : তুরস্কের সেন্ট্রাল ব্যাংকের পরামর্শে সেই দেশের সরকার ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রচলন বন্ধ করে দেয় ৩০ এপ্রিল, ২০১১।

ভারত : এবং ভারত। এখানে ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ে চর্চা চলছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, ক্রিপ্টোকারেন্সি সত্যিই অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করে কিনা, সেটা সরকার আগে পরীক্ষা করে দেখুক। তারপর এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে দেশের প্রধান ব্যাঙ্ক।

Technological Limitations একটা বড়ো সমস্যা। সরকারের দ্বারা নিযুক্ত কমিটি যে মতামত দিয়েছে, তার সারাংশ :

There are surely technical elements to cosider. For example, technological advancement in crypto currencies such as bitcoin result in high up-front costs to miners in the form of specialized hardware and software. Cryptocurrency transactions are normally irreversible after a number of blocks confirm the transaction. Additionally, Cryptocurrency private keys can be permanently lost from local storage due to malware, dataloss or the destruction of the physical media. This precludes the Cryptocurrency from being spent, resulting in its effective removal from the markets.

(লেখক অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক আধিকারিক)

বাংলাদেশে হিন্দু গণহত্যার মিছিল

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

আমরা সবাই জানি এক ভয়ংকর হাড়হিম করা হিন্দু গণহত্যার মধ্য দিয়ে আদি বঙ্গপ্রদেশকে চিরে পূর্ব অংশকে পাকিস্তান নামের এক বকচ্ছপ দেশের অংশভুক্ত করা হয়েছিল। ভাবা গিয়েছিল এবার হিন্দুর রক্তের জন্য মুসলমানদের পিপাসা মিটবে। এমনকী জিন্নার ঘোষণার মধ্যে অঙ্গীকার ছিল যে সব ধর্মের অধিবাসী পাকিস্তানে সমান নাগরিক সুবিধা ভোগ করবে। কিন্তু না তা হয়নি। ১৯৪৭-এর পরেও হিন্দু গণহত্যা হয়েছে আরও পদ্ধতিমাফিক। তারপর এল ১৯৭১। পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলাদেশ নামে (যদিও নামটা আপত্তিকর) নতুন জাতীয়তাবাদী ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আবির্ভূত হয়। গালভরা মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্থাপিত হওয়ার পিছনে হিন্দু ভারতের ঐতিহাসিক অবদান ছিল। প্রত্যাশিত ছিল যে এইবার হিন্দু তার হৃত অধিকার ফিরে পাবে। কিন্তু ভবী ভুলবার নয়। ১৯৭১-এ আমরা জানতে পেরেছি নয়মাস ব্যাপী মুক্তিযুদ্ধ ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম গণহত্যা যা ইহুদি হলোকাস্টকেও ছাড়িয়ে যায়।

এবং ১৯৭১ সালের পরে লাগাতার হিন্দু গণহত্যা হয়েছে, হচ্ছে এবং গড়পড়তা নিয়ম অনুসারে ভবিষ্যতেও হবে। এই কয়েকদিন আগেও হয়েছে ইসকন মন্দিরে হামলা। নীচে একটা বিবরণ দেওয়া হলো।

১৯৪৭ সালের পরের ঘটনা :

১৯৫০-এর বরিশাল দাঙ্গা, ১৯৬২-র রাজশাহী গণহত্যা, ১৯৬৪-র পূর্ব- পাকিস্তান দাঙ্গা, সীতাকুণ্ড গণহত্যা, অ্যান্ডারসন ব্রিজ গণহত্যা, মুলাদী গণহত্যা।

১৯৭১ সালের ঘটনা :

আদিত্যপুর গণহত্যা, আখিরা গণহত্যা, বাগবাটি গণহত্যা, বাড়িয়া গণহত্যা, বরগুনা গণহত্যা, ভীমনালি গণহত্যা, বকচর গণহত্যা, বুরুঙ্গা গণহত্যা, চর ভদ্রাসন গণহত্যা, ডাকরা গণহত্যা, ডেমরা গণহত্যা, ধপধুপ গণহত্যা,

গাভানরেরকাঠি গণহত্যা, গালিমপুর গণহত্যা, গোলাহাট গণহত্যা, হাসমদিয়া গণহত্যা, ইশানগোপালপুর গণহত্যা, জান্ডি গণহত্যা, জাঠিভাঙ্গা গণহত্যা, যোগীশো ও পলশা গণহত্যা, কালীগঞ্জ গণহত্যা, কড়াই কাদিপুর গণহত্যা, কেতনার বিল গণহত্যা, কৃষ্ণপুর গণহত্যা, মধ্যপাড়া গণহত্যা, মাকালকান্দি গণহত্যা, মুজাফফরাবাদ গণহত্যা, নড়িয়া গণহত্যা, নিকলি গণহত্যা, পোমার গণহত্যা, রমনা গণহত্যা, শতানিখিল গণহত্যা, সেন্দিয়া গণহত্যা, শাঁখারিবাজার বধ্যভূমি, শাঁখারিকাঠি গণহত্যা, শ্রী অঙ্গন গণহত্যা, সূর্যমণি গণহত্যা, সুত্রাপুর গণহত্যা।

১৯৭১ সালের পরের ঘটনা

১৯৮৯ বাংলাদেশ প্রোগ্রাম, নিদারাবাদ হত্যা মামলা, ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ হিন্দু বিরোধী সহিংসতা, ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ সহিংসতা, বাংলাদেশে ইসলামি চরমপন্থীদের হামলা, ২০১২ সালে ফতেপুর সহিংসতা, ২০১২-তে হাটহাজারী সহিংসতা, ২০১২-তে চিরিরবন্দর সহিংসতা, ২০১৩-তে বাংলাদেশ হিন্দু বিরোধী সহিংসতা, ২০১৪-তে বাংলাদেশ হিন্দুবিরোধী সহিংসতা, ২০১৬-তে নাসিরনগর সহিংসতা, ২০২১-এ বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সহিংসতা।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে গণহত্যা

চুকনগর গণহত্যা : এটি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দ্বারা ঘটানো একটা বৃহৎ গণহত্যা। ১৯৭১ সালের ২০ মে খুলনার ডুমুরিয়ায় সংঘটিত হয় এবং এটি যুদ্ধের সময় সবচেয়ে বড়ো গণহত্যার একটি। গণহত্যায় নিহত ব্যক্তির সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। গণহত্যায় নিহতদের অধিকাংশই ছিল পুরুষ, যদিও অসংখ্য নারী ও শিশুকেও হত্যা করা হয়েছিল।

অবস্থান : চুকনগর, খুলনা পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ)।

তারিখ : ২০ মে ১৯৭১।

টার্গেট : বাঙ্গালি হিন্দু।

হামলার ধরন : আগুনের গোলা ছুঁড়ে ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, ব্যাপক হত্যাকাণ্ড।

অস্ত্র : হালকা মেশিনগান, আধা-স্বয়ংক্রিয় রাইফেল।

মৃত্যু : ৮ হাজার থেকে ১০ হাজার।

অপরাধী : পাকিস্তান সেনাবাহিনী, রাজাকার।

চুকনগর ভারতীয় সীমান্ত সংলগ্ন খুলনার ডুমুরিয়ায় একটি ছোটো শহর। যুদ্ধ শুরুর পর অনেকেই খুলনা ও বাগেরহাট থেকে পালিয়ে যায়। তারা ভোদ্রা নদী পার হয়ে সাতক্ষীরা রোড দিয়ে সীমান্ত পার হয়ে চুকনগরে আসে। ১৯৭১ সালের ১৫ মে আশেপাশের এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু চুকনগরে জড়ো হয়, কারণ পাকিস্তানি আক্রমণের গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল। ২০ মে, সকাল দশটার সময়ে আধা-স্বয়ংক্রিয় রাইফেল এবং হালকা মেশিনগানে সজ্জিত ১০-৩০ জন পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর একটা দল প্রায় তিনটি ট্রাকে আসে। চুকনগর বাজারের বাম কোণে ঝাউতলা (তখন পাতখোলা নামে পরিচিত) নামে একটা জায়গায় তারা থামে। তারপর তারা পাতখোলা মাঠে গুলি চালায় এবং পরে চুকনগর বাজারে চলে যায় এবং বিকেল তিনটে পর্যন্ত গুলি চালাতে থাকে। গণসংহারের হাত থেকে বাঁচতে পালানোর ব্যর্থ প্রচেষ্টায় নদীতে ঝাঁপ দেওয়ায় অনেকে ডুবে মারা যায়। পরে স্থানীয় লোকজন ডাঙার

লাশগুলো নদীতে ফেলে দেয়।

গণহত্যায় নিহত ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ

শাঁখারি বাজার গণহত্যা ছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কীর্তি। ২৬ মার্চ ১৯৭১ সালে পুরানো ঢাকার শাঁখারিবাজার জনশূন্য হয়ে পড়ে এবং দীর্ঘদিন রাস্তায় লাশ পড়েছিল।

শাঁখারিবাজার পুরানো ঢাকার কেন্দ্রস্থলে একটি হিন্দু এলাকা। এখানে মূলত শাঁখারিদের বসবাস। এরা হিন্দু বাঙ্গালি এবং এখনও খোলস থেকে শাঁখার চুড়ি তৈরির তাদের ঐতিহ্যগত পেশায় নিযুক্ত রয়েছে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী শাঁখারিবাজার রোডের খুব কাছে জগন্নাথ কলেজ ও ব্রাহ্ম সমাজে ক্যাম্প করে। অপারেশন সার্চলাইট চলাকালে শাঁখারিবাজার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রধান প্রাপ্তি।

ঘটনা :

২৫ মার্চ সন্ধ্যায় পাকিস্তানি সেনারা রাস্তায় নেমে আসে। তারা নবাবপুর রোড ধরে সদর ঘাটের দিকে এগিয়ে যায়। শাঁখারিবাজার রোডের মোড়ে তারা একটি বাড়িতে গোলা বর্ষণ করলে বাড়ির একটি অংশ ধ্বংস হয়ে যায়। গোলাগুলিতে তিনজন মারা যায় এবং পাঁচ থেকে ছয়জন আহত হয়।

২৬ মার্চ বিকেলে পাকিস্তানি সেনারা শাঁখারিবাজার আক্রমণ করে। তারা ২ নম্বর প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে। ৪৭ নম্বর বাড়ির বাবা ও ছোটো ভাইকে হত্যা করে। হত্যাযজ্ঞ থেকে বেঁচে যাওয়া বড়ো ভাই অমর সুর বাড়ির পেছনের সরু গলি দিয়ে পালিয়ে যায়। খানসেনারা বাসিন্দাদের তাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার নির্দেশ দেয়। এরপর তারা বেরিয়ে এলে তাদের গুলি করে হত্যা করা হয়। পাকিস্তানি সেনারা এলাকার চত্বরে তাদের হত্যাযজ্ঞ অব্যাহত রাখে। শুধুমাত্র চন্দন সুরের বাড়িতেই ৩১ জন হিন্দুকে হত্যা করা হয়। চন্দন সুর এলাকার একজন প্রতিষ্ঠিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। নির্বাচনের আগে, ঢাকা নবাব পরিবারের খাজাখায়রুদ্দিন সুরকে তার পক্ষে জোরসওয়াল করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন খায়রুদ্দিন। অভিযোগ করা হয়েছে যে, গণহত্যার সময় খাজা খায়রুদ্দিন পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে চন্দন সুরের বাসভবনে নিয়ে গিয়েছিলেন। কালিদাস বৈদ্যের মতে, আশেপাশের ১২৬ জন হিন্দুকে এক বাড়িতে আটকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

পরবর্তী ঘটনা :

জনশূন্য জনপদে পরিণত হয় শাঁখারিবাজার। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের স্থানীয় সহযোগীরা ঘরের সোনা, গহনা ও আসবাবপত্র লুট করে। বিহারি মুসলমানরা বাড়িঘর দখল করে লোকালয়ে বসতি স্থাপন করে। পাকিস্তানি শাসক শাঁখারিবাজার রোডের নাম পরিবর্তন করে টিক্কা খান রোড রাখে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর যারা বেঁচে ছিলেন তারা তাদের এলাকায় ফিরে আসেন। ততক্ষণে পুরো এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এরপর শাঁখারিদের নতুন করে জীবন সংগ্রাম শুরু করতে হয়।

১৯৭২ সালে, শাঁখারিবাজার গণহত্যায় নিহতদের স্মরণে শাঁখারিবাজার রোডের পূর্ব প্রান্তে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমান নিহতদের পরিবারকে ২, ০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তবে এখনও পর্যন্ত নিহতের পরিবারের সদস্যরা কোনও ক্ষতিপূরণ পাননি। ১৯৯৭ সালে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উপলক্ষে, শাঁখারিবাজার একটি স্যুভেনির প্রকাশ করে যেখানে গণহত্যার শিকারদের নাম প্রকাশিত হয়েছিল।

জাঠিভাঙ্গা গণহত্যা :

অবস্থান : জাঠিভাঙ্গা, ঠাকুরগাঁও, বাংলাদেশ (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান)

তারিখ : ২৩ এপ্রিল ১৯৭১

টার্গেট : বাঙ্গালি হিন্দু।

হামলার ধরন : গুলি, অগ্নিসংযোগ, গণহত্যা, ব্যাপক ধ্বংসলীলা।

অস্ত্র : মেশিনগান।

মৃত্যু : ৩০০০-৪৫০০।

অপরাধী : পাকিস্তানি খানসেনা, রাজাকার।

জাঠিভাঙ্গা গণহত্যা ছিল ২৩ এপ্রিল ১৯৭১ সালে সংঘটিত পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমানে বাংলাদেশ) জাঠিভাঙ্গা, ঠাকুরগাঁও জেলার বাঙ্গালি ও রাজবংশী জনগোষ্ঠীর উপর ঘটা একটা গণহত্যা। এটা রাজাকারদের সহযোগিতায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল। ১৯৭১ বাংলাদেশ গণহত্যা। সহযোগীদের মধ্যে জামায়াতে ইসলামি, মুসলিম লিগ এবং পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির সদস্যরা অন্তর্ভুক্ত ছিল। গণহত্যার শিকার সবাই ছিল হিন্দু। অনুমান করা হয় যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ৩০০০-এরও বেশি বাঙ্গালি হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছিল।

ঘটনা :

২৩ এপ্রিল ভোরে, জগন্নাথপুর, চাখালদি, সিংগিয়া, চণ্ডীপুর, আলমপুর, বাসুদেবপুর, গৌরীপুর, মিলনপুর, খামারভোপলা এবং সুখানপোখরির বারোটি গ্রামের হিন্দুরা ভারতের উদ্দেশে রওনা হয়। তারা জাঠিভাঙ্গা নামক স্থানে জড়ো হয়। তাদের আগমনের পরপরই, স্থানীয় মুসলমানরা জাঠিভাঙ্গা থেকে তাদের বের হওয়ার পথ বন্ধ করে দেয় এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে অবহিত করে। হিন্দু পুরুষদের মিছিল করে নিয়ে যাওয়া হয় জাঠিভাঙ্গা মাঠের দিকে। ততক্ষণে পাকিস্তানি সেনারা দুটি সামরিক ট্রাকে এসে পলায়নরত হিন্দুদের লাইনে দাঁড়াতে বাধ্য করে এবং মেশিনগান দিয়ে গুলি করে। সকাল থেকে শুরু হয়ে বিকাল পর্যন্ত চলে হত্যাকাণ্ড। সামরিক বাহিনী চলে যাওয়ার পর, সহযোগীরা মৃতদেহগুলোকে পথরাজ নদীর কাছে নিয়ে যায় এবং মাটি দিয়ে ঢেকে দেয়।

আনুমানিক হতাহতের সংখ্যা ৩০০০ থেকে ৪৫০০-এর আশপাশে। যাইহোক, সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয় যে গণহত্যায় ৩০০০-এরও বেশি লোক মারা গিয়েছিল।

২০০৯ সালে বাংলাদেশ সরকার গণহত্যার স্থানে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করে। ২০১১ সালে, গণহত্যা থেকে রক্ষা পাওয়া এবং ক্ষতিগ্রস্তরা নিহতদের স্মরণে একটি শোক মিছিল বের করে, তারপরে একটি শোক সভা হয়। সভায় বক্তারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবি করেন। □

পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষায় বসুন্ধরা দিবসের গুরুত্ব বাড়ছে

সরোজ চক্রবর্তী

সমগ্র বিশ্বব্যাপী ২২ এপ্রিল দিনটিকে 'বিশ্ব বসুন্ধরা দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। এই দিনটি পৃথিবী মাতার সম্মানে উৎসর্গ করা হয়েছে। প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এবং পৃথিবীকে নিরাপদ বসবাসযোগ্য রাখতে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ২২ এপ্রিল দিনটি পালন করা হয়। এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে তোলার দাবিতেই বিশ্বজুড়ে পালিত হচ্ছে বসুন্ধরা দিবস।

মনের আনন্দে শিল্পী গাইবেন তাঁর গান, সৃষ্টির নানা পসরা সাজিয়ে বসবেন সৃষ্টিকর্তা, শিশুরা খেলবে, ঘুরবে, ফিরবে নিজের মতো করে, নারীরা পাবেন সম্মান, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা। গুণীরা পাবেন যোগ্য সম্মান। প্রকৃতির আঁচলের স্পর্শে পৃথিবী মাতার কোলে বিশ্রাম নিয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম যেন শান্তিতে কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করতে পারে— এমনই এক সুস্থ পৃথিবীর দাবি তুলেছে সৃজনশীল মানুষেরা।

সানফ্রান্সিস্কোতে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কো সম্মেলনে শান্তিকর্মী জন ম্যাককনেল ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীমাতার সম্মানে একটা দিন উৎসর্গের জন্য প্রস্তাব করেন। পৃথিবীমাতার জন্য উত্তর গোলার্ধে বসন্তের প্রথম দিন হিসেবে ২১ মার্চ দিনটি পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীতে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর ১৯৭০ সালে মার্কিন সেনেটর গেলর্ড নেলসন ও ডেনিস হেইসের উদ্যোগে প্রতি বছর ২২ এপ্রিল দিনটি 'বসুন্ধরা দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। বিশ্বের মোট ১৯২ দেশে এই দিবস পালিত হয়।

২০০৯ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ অ্যাসেম্বলির ৬৩তম অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ইকোলজিক্যাল চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য অর্জনের জন্য প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সুসঙ্গতিতে সহায়তা এবং পৃথিবীর ইকোসিস্টেমকে রক্ষা করার নির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করতে হবে। বিশ্বকে দূষণমুক্ত ও সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্যই এই দিবস পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কারণ এই পৃথিবীতে শুধুমাত্র মানুষ থাকে না। মানুষ ছাড়া এই পৃথিবী আরও নানান প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদের বাসস্থান। সেই কারণে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলাই আমাদের এই দিবস পালনের মুখ্য উদ্দেশ্য। গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের কারণে জলবায়ু পরিবর্তনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এখন প্রাকৃতিক দুর্যোগে জর্জরিত। এমন প্রেক্ষাপটে প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে পৃথিবীকে নিরাপদ রাখতে 'বসুন্ধরা দিবস' উদ্‌যাপনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন শান্তিদূত জন ম্যাককনেল। পৃথিবী জুড়ে পরিবেশ নিয়ে চিন্তাভাবনা, পরিবেশের নানাবিধ সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য মানুষের মধ্যে পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির অত্যন্ত প্রয়োজন। সম্প্রতি মানবজীবন কঠিন ও অভাবনীয় সত্যের মুখোমুখি হয়েছে করোনা ভাইরাসের দৌলতে। পৃথিবী মাতা নিজেই সক্রিয় হয়েছে দূষণমুক্ত পরিবেশ তৈরির জন্য। তাই করোনা ভাইরাসের মতো একটি ভয়ংকর ভাইরাসকে মানব সমাজে হাজির করিয়ে আধুনিক উচ্ছৃঙ্খল, বেহিসেবি প্রযুক্তি নির্ভর দূষণ সৃষ্টিকারী মানবজাতিকে শিক্ষা দিতে চাইছেন। যানবাহন, মানুষের ভিড় সবকিছুকে মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে বন্ধ করেছেন। মানবজাতির উন্মত্ততাকে থামিয়ে দিয়ে পরিবেশ ও প্রকৃতিকে দূষণমুক্ত করেছেন। শুধুই উন্নতির জন্য উন্নতির মত্ততা ও বিশ্বের বিত্তবানশ্রেণীর একপেশে ভোগবাদী জীবনযাত্রা এবং বস্তু কোলাহলপূর্ণ সংস্কৃতির বিশ্বায়ন, প্রাণ ও প্রাণী সম্পদকে এমনভাবে ব্যবহার করে এসেছে, যা থেকে জন্ম নিয়েছে জীবনের বিপক্ষে নিয়ত যুদ্ধের ইতিহাস।

মানুষের পরিচয় আজ এক বিপুল সম্ভাবনাময় ক্রেতা নামক সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মূল্যবোধহীন জীবনযাত্রার পরিণতি রূপে। উপকরণের প্রাচুর্যের প্রকোপে বিদ্ধ পৃথিবীর বৃহত্তম সম্পদভোগী দেশগুলি এখন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে কোনও সমাধান দিতে পারছে না। তারা অসহায়। লাগামছাড়া প্রয়োজন মেটাতে অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদন করতে হয়েছে প্রধানত দুটি কারণে— ১. ভোগবাদী জীবনযাপনের জন্য এবং ২. পৃথিবীতে জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য। এই বিপুল জনবিস্ফোরণের চাহিদা মেটাতে শুরু হয়েছে সামঞ্জস্যহীন উদ্‌যাপন। এর ফলে বিপুল ক্ষতিকারক বর্জ্য পদার্থের সৃষ্টি হয় যা প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীবজগতের ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়। বর্তমানে অতি উন্নত দেশ এবং অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলি প্রায় সকলেই এই বিষয়ে কম-বেশি দায়ী। পৃথিবীতে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণে রাসায়নিক জঞ্জাল জমে এবং মারাত্মক ক্ষতিকারণ গ্যাসীয়, তরল, কঠিন রাসায়নিক যৌগগুলি বিস্তৃত হয়ে দ্রুত পালটে দিচ্ছে অবহাওয়া, জীব গঠন এবং ভবিষ্যতের পৃথিবীকে। এই গভীর সংকটকালে সুস্থ মানুষের জীবনযাত্রার পথ খুঁজতে বসুন্ধরা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভোগবাদ ও ক্রেতা সংস্কৃতির থেকে দূরে এসে পরিবেশ রক্ষার দিকে নজর দেওয়ার জন্যই বিশ্বব্যাপী এই উদ্যোগ। একটা সুষ্ঠু ও সুন্দর পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে এই প্রচেষ্টা। ▯

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থা কোন পথে?

তরুণ কুমার পণ্ডিত

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যখন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা নিজের নিজের স্কুলে অর্থাৎ পরীক্ষাকেন্দ্র ছাত্র বা ছাত্রীর হোম সেন্টার করার ব্যবস্থা করলেন, তখন আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকছিল না যে কেন এরকম একটা সিদ্ধান্ত। ২০২৪-এর লোকসভা ভোট এবং ২০২৬-এর বিধানসভা ভোট।

শিউরে উঠতে হয় স্কুলগুলোর কাণ্ডকারখানা দেখে। গণ টোকাটুকি চলছে, শিক্ষক শিক্ষিকারা বলছেন যে যা করবে চুপচাপ করবে, স্কুলের সভাপতি এসে

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা বাচ্চা বাচ্চা ছেলে-মেয়ে। তারা হোম সেন্টার পাচ্ছে না, অন্য স্কুলে যাচ্ছে পরীক্ষা দিতে, অথচ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী যারা কিনা দুদিন বাদে কলেজে যাবে, গড়পড়তা বয়স মোটামুটি ১৮ বছর, তাদের কিনা দেওয়া হচ্ছে হোম সেন্টার!

বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষিকা ও নন টিচিং স্টাফদের মুখে যা শুনছি, তাতে হাড় রীতিমতো হিম হয়ে যাবার কথা। বামফ্রন্ট আমলে যে মধ্যমেধার রমরমার যুগ শুরু হয়েছিল, পরিবর্তনের কাণ্ডারির হাত ধরে আজ সেটা নিম্নমেধার অতি রমরমাতে পরিণত। ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনে প্রবলভাবে জিতে আসার পরই তৃণমূলেশ্বরী শিক্ষাক্ষেত্রকে তাঁর ভোট পিশাচিনী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে মাপার যে ভিশন নিয়েছিলেন, ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে জিতে আসার পর তাঁর ওই আগের ভিশনের ক্রমসূত্র মেনে মিশন তৈরি করেছেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রকে ধ্বংস করার, পরিবর্তে লক্ষ্য বলছেন, যে বাচ্চারা যা করছে, করতে দিন।

আমার খুব পরিচিত একজনের কাছ থেকে বসিরহাটের একটি স্কুলের ঘটনার কথা শুনলাম। ওই স্কুলটির সভাপতি যিনি আবার ওখানকার গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান তাঁর ছেলে পরীক্ষা দিচ্ছে। ইংরেজি পরীক্ষার দিন পরীক্ষা শুরু হওয়ার ঠিক পনেরো মিনিটের মাথায় ছেলেটি হঠাৎ অসুস্থ বোধ করতে থাকে। অতঃপর তাকে স্কুলের সিক রুমে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা দেওয়ানোর বন্দোবস্ত করা হয়। সিক রুমে ছেলেটির পাহারা ও পরিচর্যার দায়িত্বে থাকলেন একজন আশাকর্মী মহিলা, যিনি আবার এই পরীক্ষার্থী ছেলেটির মা।

আর ওই গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান মানে ওই স্কুলের সভাপতি সারাক্ষণ চেয়ার পেতে স্কুলে বসে থাকলেন, যাতে কোনো শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক বা পরিদর্শক এলে তাঁর ছেলের পরীক্ষা দেওয়ার ঘরের দিকে যেতে না পারেন। আসলে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের নিয়ে মমতা ব্যানার্জির পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য জলের মতো পরিষ্কার। এরাই উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে কলেজে গিয়ে টিএমসি ছাত্র ইউনিয়ন করবে, সংগঠনের কাজে এদেরকে দলে লাগাবে। তার পরের বছর লোকসভা ভোটে এবং ২০২৬-এ বিধানসভা ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস এদের কাজ করাবে আর এই ছাত্ররাও ভাবছে যে আমরা পাশ করলেই হবে, পড়াশোনা করার দরকার নেই। তারপর শাসক দলের অনুগত হয়ে থেকে কোনো নেতা বা নেত্রীর লেজুড়বৃত্তি করে ঠিক একটা চাকরি জুটিয়ে নেওয়া যাবে।

এদের খুব একটা দোষও দেওয়া যায় না। কারণ এই বয়সে খুব পরিণত চিন্তা তৈরি না হওয়াই স্বাভাবিক। এছাড়া বেড়ে ওঠবার বয়সে আশেপাশের সমাজ জীবনে আদর্শের ক্ষয়িষ্ণুতা দেখতে দেখতে এদের শৈশব ও যৌবনকালের নৈতিক মেরুদণ্ডটাই ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। দেশ ও সমাজের কথা তো দূর, নিজেদের প্রকৃত কল্যাণ কীসে হবে— তা ভাবতেও আজ এরা অসমর্থ। সব মিলিয়ে ভয়ংকর পরিস্থিতি। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার এই নৈরাজ্য ও ব্যভিচার পরবর্তী প্রজন্মকে কোথায় নিয়ে যাবে, ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়। শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতি সমগ্র সমাজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে পারে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আফ্রিকার সবচেয়ে নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি অব সাউথ আফ্রিকার মূল ফটকে মোটা হরফে লেখা রয়েছে, 'কোনো জাতিকে ধ্বংস করার জন্য পারমাণবিক হামলা কিংবা ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের দরকার নেই, বরং সেই জাতির শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় প্রতারণার সুযোগ দিলেই হবে। এভাবে পরীক্ষা দিয়ে তৈরি হওয়া ডাক্তারদের হাতে রোগীর মৃত্যু হবে। ইঞ্জিনিয়ারের দ্বারা দালান কোঠা, ইমারত ও ব্রিজ ধ্বংস হবে এবং অর্থনীতিবিদদের দ্বারা দেশের আর্থিক পরিকাঠামো দেউলিয়া হবে। এছাড়া বিচারকের হাতে বিচার ব্যবস্থার কবর রচনা হবে। সুতরাং শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার অর্থ হলো--- একটি জাতির অবলুপ্তি। আমাদের রাজ্য কি সেই পথেই এগোচ্ছে?

সবাই পাগল

খিলগাঁও দেবমন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুর করে ইজাজুল ইসলাম খান। সিসি-ক্যামেরা ফুটেজে দেখা যায়, মাথায় কালো টুপি, কালো প্যান্ট ও পাঞ্জাবি পরে সে মন্দিরে ঢোকে, মিনিট তিনেক পরে কাজ সেরে বেরিয়ে আসে। মন্দির কর্তৃপক্ষ পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে এবং বলার চেষ্টা করে যে, লোকটি মানসিক ভারসাম্যহীন। স্থানীয় লোকজন আপত্তি করলে পুলিশ স্বীকার করে যে, ইজাজ উগ্রবাদী, জঙ্গি এবং তার বাসা থেকে চাপাতি, জিহাদি বই ও কাগজপত্র উদ্ধার করে। ইজাজুলের স্বজনরা পুলিশকে জানিয়েছে যে, ইজাজ বেশ কিছুদিন ধরে মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন আচরণ করছিল।

'এই পাগলকে নিয়ে যাবে সেই পাগলের দেশে—'। কদিন আগে কুমিল্লার ইকবাল দুর্গামণ্ডপে কোরান রেখেছিল। পুলিশ প্রথমে তাকে 'পাগল' বলেছে। পুলিশ বারবার অপরাধীকে বাঁচাতে চাইছে। মূর্তিভাঙা বাংলাদেশে অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা নয়। কারণ দেশটির একটি ধর্ম আছে, পুলিশ সেই ধর্মাবলম্বীদের পক্ষে স্বজনপ্রীতি করে ও করবে। আগে মন্দির আক্রমণ বা প্রতিমা ভাঙার প্রায় প্রতিটি ঘটনায় পুলিশ অপরাধীকে পাগল বা মানসিক ভারসাম্যহীন আখ্যা দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। হুজুররা মূর্তি ভাঙার পক্ষে ওয়াজ করেন, মুরিদরা মূর্তি ভাঙবে এটাই তো স্বাভাবিক, তাই না? এজন্যে হয়তো পাগলে দেশ ভরে গেছে!

বাংলাদেশে এই পাগলরা জাতে পাগল, তালে ঠিক! এরা শুধু মন্দির চেনে? 'মরলে শহিদ, বাঁচলে গাজি', ধরা পড়লে 'পাগল'। এই পাগলরা আসলে ধর্ম কায়েমের সংগ্রাম চালাচ্ছে, সমস্যাটি সেখানে। ধর্ম পালনে সমস্যা নেই, সমস্যাটি ধর্ম কায়েমে। আপত্তি সেখানে। এজন্যে পুলিশ ওয়ারি মন্দিরে আক্রমণকারী শফিউল্লাহকে ধরতে পারছে না। দু'শো লোক মন্দির আক্রমণ করলে পুলিশ বলতে পারে, 'ওঁরা আমাদের কথা শুনছে না'। বাংলাদেশের মানুষ জানেই না বা জানতে চায় না বা মানতে চায় না যে দেশে হিন্দুর ওপর অত্যাচার হচ্ছে। দেশে সবাই ভাবের পাগল!

'পাগল' সার্টিফিকেট পুলিশ দিচ্ছে। ডাক্তার বা মনোবিজ্ঞানী নন। বাংলাদেশের পুলিশ তাই একাধারে ডাক্তার ও মনোবিজ্ঞানী— 'একের ভেতরে তিন'। চট্টগ্রামে সরস্বতী দেবীর ৩৫টি মূর্তি ভাঙার পর সংবাদ প্রতিদিনে ১৫ জানুয়ারি ২০২২ পুলিশের এই বক্তব্য ছাপা হয়— 'কেউ পরিকল্পিতভাবে প্রতিমাগুলো ভেঙেছে বলে মনে হয়নি। ছোটো বাচ্চারা হয়তো খেলার ছলে বা ঠেলাগাড়ি, মিনি-ট্রাকে বাঁশ নেওয়ার সময় অন্ধকারে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তবে আমরা বিষয়টি তদন্ত করে দেখেছি'। কী বুঝলেন? আর ওই যে 'তদন্ত', ওটা কোনোকালে শেষ হবে না!

ওয়ারিতে দু'শো মানুষের রাতের বেলায় রাধাকান্ত জিউ মন্দিরে হামলার প্রেক্ষিতে বিবিসি বাংলা ১৮ মার্চ ২০২২ একটি প্রতিবেদনে পুলিশের ভাষ্য হচ্ছে, 'হামলার অভিযোগ সঠিক নয়। জমির মালিকানার দাবিদার একটি পক্ষ সেখানে সংস্কার কাজ করার সময় পুরোনো দেওয়াল ভেঙে পড়েছে। তবে হামলার অভিযোগ ওঠার পর মন্দিরটিতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে'। বিবিসি নিউজটি ট্যুইট করেছে। পাঠক, ৬০/৭০-এর দশকের বিবিসি বাংলা, আর এখনকার বিবিসি বাংলা এক নয়, ওদের নিউজ প্রায়শ অ্যান্টি আওয়ামি লিগ, অ্যান্টি ভারত এবং অ্যান্টি হিন্দু। ওরাও পাগলের সমর্থক।

—**শিতাংশু গুহ,**
নিউইর্ক।

গান্ধীকথা

দক্ষিণ আফ্রিকায় নানাবিধ আন্দোলনে থেকেও মুখ্যত আরব ব্যবসায়ীদের দৌলতে আইন ব্যবসায় থেকে গান্ধীজীর ভালো আয় হচ্ছিল। ইতিমধ্যে সেখানে তাঁর তিন বছর কেটে গিয়েছে। তিনি দেখলেন যে, লোকে বুঝতে পেরেছে যে ওখানে তাঁর থাকা দরকার। গান্ধীও তাই স্থির করলেন, দেশ থেকে স্ত্রী-পুত্রকে এনে ওদেশেই বসবাস করবেন। তাদের নিয়ে আসার জন্য তিনি ১৮৯৬ সালের ৫ জুন জাহাজে চাপেন। সেই সময় কুড়ি জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের ক্ষোভ সম্বন্ধে ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার জন্য গান্ধীকে নিয়োগ করেছিলেন। ভারতে পৌঁছে রাজকোটে বসে মাসখানেকের মধ্যে গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নিয়ে একটি প্রচারপত্র লিখে ফেলেন। পুস্তিকাটির মলাট সবুজ রঙের ছিল। তাই সেটি 'The Green Pamphlet', নামে পরিচিত হয়েছিল। দশ হাজার কপি ছাপা হয়েছিল এবং দেশের বিভিন্ন বাংলা, ইংরেজি সংবাদপত্র ও প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের কাছে পাঠানো হয়েছিল। তদুপরি, বিষয়টি নিয়ে গান্ধী দেশের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। স্যার ফিরোজ শাহ মেহতা বোম্বাইয়ের কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর ইনস্টিটিউটে একটি সভার আয়োজন করেছিলেন। তিনি গান্ধীকে তাঁর বক্তৃতা লিখে নিয়ে যেতে বলেছিলেন; কারণ, বোম্বাইয়ের খবর কাগজের রিপোর্টিং তেমন সুবিধের ছিল না। গান্ধী তাঁর বক্তৃতার উপসংহারে বলেছিলেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় আমরা চারিদিক থেকে আক্রান্ত। আমরা শিশু। আপনাদের কাছে আশ্রয়ের জন্য আবেদন করার একটা অধিকার আমাদের আছে।' উল্লেখ্য, ১৯০১ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে যাওয়ার সময় ট্রেনে স্যার ফিরোজ শাহ গান্ধীকে বলেছিলেন— 'দেখো হে গান্ধী, তোমার ওই ব্যাপার নিয়ে কিছু করা সম্ভবপর হবে না। তুমি যে প্রস্তাব উত্থাপন করতে চাও, সেটা অবশ্য আমরা পাশ করিয়ে দেব। কিন্তু বুঝে দেখো; স্বদেশেই কি আমাদের কিছু অধিকার আছে? নিজেদের দেশে যতক্ষণ না নিজেদের হাতে আমরা ক্ষমতা পাচ্ছি, ততদিন দেশের বাইরে যেসব ভারতীয় আছেন, তাদের অবস্থার উন্নতি হতে পারে না।'

বোম্বাইয়ের পরে পুনেতে গোখলের সঙ্গে দেখা করে গান্ধী মাদ্রাজ গিয়েছিলেন।

সেখান থেকে কলকাতা। কলকাতায় কারও সঙ্গে জানাশোনা না থাকায় গান্ধী গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে উঠেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে বলেছিলেন, দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের আন্দোলনের জন্য বাঙ্গালিরা উৎসাহ দেখাবে বলে মনে হয় না। অমৃতবাজার ও বঙ্গবাসী পত্রিকার অফিসে তাঁর অভিজ্ঞতা মোটেই আশাপ্রদ হয়নি। এইসব নৈরাশ্যজনক অভিজ্ঞতার পরেও গান্ধী কলকাতায় এক সভার ব্যবস্থা করতে প্রায় সমর্থ হয়েছেন এমন সময় ডারবান থেকে দাদা আবদুল্লার তারবার্তা এলো— 'পার্লামেন্টের অধিবেশন বসছে জানুয়ারিতে। সত্বর ফিরে আসুন।' তাঁকে কেন হঠাৎ করে কলকাতা ছেড়ে যেতে হচ্ছে, বিশদভাবে তার কারণ ব্যাখ্যা করে গান্ধী বোম্বাই রওনা হয়ে যান। দাদা আবদুল্লা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন 'গান্ধীভাই' যেন বিনা অর্থব্যয়ে পরিবারবর্গ-সহ তাঁদের নতুন কেনা 'কুরল্যান্ড' জাহাজে ডারবান যান।

গান্ধী কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সেই প্রস্তাবে রাজি হন। ডিসেম্বরের গোড়ায় সেই যাত্রায় গান্ধীর সঙ্গে ছিল তাঁর স্ত্রী, দুই পুত্র এবং তাঁর বিধবা ভগ্নীর একমাত্র ছেলে। গান্ধীজী তখন জানতেন না, ডারবান বন্দরে তাঁকে শ্বেতাঙ্গদের তীব্র হিংস্র বিক্ষোভের সম্মুখীন হতে হবে।

—বিমলেন্দু ঘোষ,
কলকাতা-৬০।

ভুবন বাদ্যকার শুধু একজন সংগীতশিল্পী নন, সাধকও বটে

কাঁচা বাদাম গানের স্রষ্টা ভুবন বাদ্যকারকে এখন চেনে না এমন লোক নেই বললেই চলে। সম্প্রতি তাঁর গাওয়া কাঁচা বাদাম গানটি ইন্টারনেটে ভাইরাল হয়। সেই নিয়ে তাঁর পরিচিতি হয় এবং অনেকেই তাঁর সঙ্গে ভিডিয়ো বানিয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বিভিন্ন ব্যবসায়িক রাজনৈতিক প্রচারেও তাঁকে ব্যবহার করা হয়। পাশাপাশি অনেক হাস্যরসাত্মক মিমও তৈরি হয় তাঁকে নিয়ে।

ভুবন বাদ্যকার কতটা ভালো গান করেন সেটা আমি বলতে পারবো না, কারণ আমি সংগীত বিশেষজ্ঞ নই, তবে তাঁর সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে দেখলাম নিতান্ত দরিদ্র ভুবন বাদ্যকার সংসার চালানোর জন্য বাদাম বিক্রি করেন। উপার্জিত অর্থ দিয়ে তাঁর কষ্টের সংসারে কোনোরকমে অন্নসংস্থান হয়। নিজের বাড়ি বলতে আছে একটি মাটির ঝুপড়ি। প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যে দিয়েই তাঁর জীবন অতিবাহিত হয় কিন্তু তবুও তিনি জীবনের সংঘর্ষে হার মেনে নেননি, এমনকী অধিক অর্থ উপার্জনের জন্য কোনো অপরাধ তিনি করেননি, কোনো অপরাধীকে অর্থলোভে সহযোগিতা করেননি। অর্থাৎ তিনি একজন সৎ ব্যক্তি।

কথাগুলো বলার অর্থ এটাই যে আজকের যুবসমাজ জীবনের সংঘর্ষে অতি সহজেই হার মেনে কখনও নেশার কবলে অথবা কখনও আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। না হয় দ্রুত ধনী হওয়ার জন্য অপরাধের পথ ধরে নিচ্ছে। এই বাস্তব পরিস্থিতিতে আমার মনে হয় ভুবন বাদ্যকার যুবসমাজের কাছে একজন অনুপ্রেরণার পাত্র। সংঘর্ষ থেকে ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়ে নয়, বরং সংঘর্ষের সম্মুখীন হয়ে একজন যোদ্ধার মতো জীবন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার নাম ভুবন বাদ্যকার।

কিন্তু ভুবনবাবু নিজের জীবনে এতো কষ্টের মধ্যেও সংঘর্ষ করে বাঁচার সেই মানসিক শক্তির অফুরন্ত ইন্ধন পাচ্ছেন কোথায়, সেটা নিয়ে যখন চিন্তা করছি, তখনই দেখতে পেলাম তাঁর কপালে চন্দনের তিলক ও গলায় তুলসী কাঠের মালা। অনুভব করলাম যে শত কষ্টের মধ্যেও ঈশ্বরের নাম জপ ভুবনবাবু কখনও ভুলে যাননি। হাতে জপের মালা এবং অন্তরে ক্রমাগত প্রভুর নাম— এই হলো ভুবনবাবুর অনন্ত শক্তির উৎস। বুঝলাম তিনি কেবল সংগীত শিল্পী নন, তিনি একজন ভক্ত সাধকও। এটাই সত্য সনাতন হিন্দু ধর্মের মূল শক্তি। ভুবন বাদ্যকার হিন্দু ধর্মের ঈশ্বর সাধনার মাধ্যমে জীবনে অতীব প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার অফুরন্ত শক্তির সন্ধান পেয়েছেন। এটাই সনাতন ধর্মের অমূল্য মাহাত্ম্য।

—শ্রী শুভশীল,
শিলিগুড়ি।

অসৎ রাজনৈতিক নেতামুক্ত ভারত চাই

আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বরাক ওবামার মেয়ে কিছুদিন একটা হোটেলে কাজ করেছেন। গুজরাটের তিন-তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী এবং দুবারের ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর তিন ভাইয়ের একজন পেট্রোল পাম্পের সামান্য কর্মচারী, একজন একটা ছোটো দোকান চালাচ্ছেন আর অন্যজন রাজ্য সরকারের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী হিসেবে কাজ করে সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন। তিন বারের সাংসদ ও দেশের সব থেকে বড়ো রাজ্য উত্তরপ্রদেশের দু'বারের মুখ্যমন্ত্রী যোগীজীর বোন মন্দিরের সামনে বসে ফুল বিক্রি করেন। বর্তমান ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের মেয়ে এয়ার হোস্টেসের চাকরি করেন। এই হলো বিজেপি নেতৃত্বের সংস্কৃতি। অন্যদিকে ৭০ বছর দেশ শাসন করা কংগ্রেসকে দেখুন। রাজীব গান্ধীর পুত্র-কন্যারা অনৈতিক ভাবে বিপুল সম্পদের কারণে আজ বিচারাধীন। জামিনে মুক্ত। পশ্চিমবঙ্গের শাসকদের কথা তো আমরা সকলেই জানি। তাদের দলের অতি সাধারণ নেতারাও কী বিশাল বিশাল প্রাসাদ বানিয়েছে তার ছবি সংবাদ পত্রে ও সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা সবাই দেখি। মায়াবতী প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন। কাশ্মীরের রাজনৈতিক নেতারা উন্নয়নের টাকার সিংহভাগ আত্মসাৎ করেছেন। কোনো উন্নতি হয়নি সেখানে।

এমনভাবে কি দেশটাকে চলতে দেবেন? অবৈধভাবে যারা লোক ঠকিয়ে অর্থ উপার্জন করেছেন তারা তো একজোট। মোদীজী ভিমরুলের চাকে ঢিল মেরেছেন। তার পাশে দাঁড়াবেন না? আসুন আমরা সকলে মিলে মোদীজীর হাত শক্তি করি।

—শ্যামল কুমার হাতি,
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

কৃষ্ণকলিরা আজও সমাজে ব্রাত্য

স্বাতী চট্টোপাধ্যায়

কৃষ্ণাঙ্গী দেবীকে আমরা পুজো করি। ভক্তিতে নতজানুও হই। কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে মা-মা ডাকে আরতির জাঁকজমক আকাশ-বাতাসকে একেবারে মুখর করে তোলে। কিন্তু এই মানুষগুলিই আবার ঘরের মেয়েকে শ্যামবর্ণ হওয়ার অপরাধে কতই না গঞ্জনা দেয়। হেয় করে। 'কালী' সম্ভাষণে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কাঁটায় বিদ্ধ করে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম সেই কাঁটার জ্বালা সহ্য করতে হচ্ছে সমাজের মেয়েদের। অথচ আজও তা আমাদের 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল না'।

প্রথমে দর্শনধারী, পরে গুণবিচারি— এই নীতি যে সমাজের রক্ত-মাংসে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে, সেখানে একটি মেয়ের গুণের চেয়েও তাঁর রূপটিকেই বেশি আমল দেওয়া হয়। রূপ আবার যেমন-তেমন হলে হবে না, হতে হবে দুধে-আলতা। এই ট্র্যাডিশন আজও সমানে চলছে।

কালো জগতের আলো। জগৎ আলো করতে কালোর তুলনা একমাত্র কালোই। বাড়ির মেয়েটিকে কালো বলে যখন কেউ ব্যঙ্গ করে তখন মেয়েটির মা তাকে জগতের আলো বলে সান্ত্বনা দেয়। তবে এটি যে নিছকই কথার কথা, তা মেয়ে না বুঝলেও, মা কিন্তু বিলক্ষণ জানেন। সাময়িকভাবে মেয়েটি তার মায়ের দেওয়া সান্ত্বনায় কালো হওয়ার দুঃখ হয়তো ভুলে যায় কিন্তু শ্যামবর্ণ হওয়ার জন্য এক ধরনের হীনমন্যতা আজীবনই তাকে যেন তাড়া করে বেড়ায়। ঘরে-বাইরে তাড়া খেতে খেতে একদিন সে নিজেকে নিজের থেকেই লুকিয়ে ফেলার জন্য সচেষ্ট হয়। রাগে-দুঃখে-অভিমানে মেয়েটি আর আয়নায় নিজেকে ঠিকভাবে দেখতেও চায় না।

হেমন্তের রাতে যখন দীপ জ্বালিয়ে শ্যামামায়ের আরাধনায় ঘরে-ঘরে কাঁসর-ঘণ্টা বেজে ওঠে, তখন সেই কালো মেয়েটি বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে শ্যামার দিকে। অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে যার জন্য ঘর-বার আলোয় আলোকিত, সেই দেবীর মতো ওর রং-ও তো কালো। অথচ তাকে নিয়ে তার আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধবের মনে জমে রয়েছে কতই না অন্ধকার। কতশত প্রশ্ন। হাজারো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, ঠাট্টা-রসিকতা— মেয়ে হয়ে জন্মেছে যখন তখন পরের ঘরে তো যেতেই হবে। কিন্তু বাবা-মায়ের গলায় কালো মেয়ে জন্ম দেওয়ার কাঁটাটা যে বিঁধেই থাকে।

সভ্যতা, সমাজ নাকি দুরন্ত গতিতে এগিয়ে চলেছে। পৃথিবীটা ছোটো হতে হতে ঘরের ড্রয়িংরুমে বন্দি। তবু আমাদের মানসিকতার কোনও বদল ঘটেছে কি? আজকের উন্নত তথ্য-প্রযুক্তির যুগেও একটি কালো মেয়েকে সমাজ খুব সাদা মনে ঘরের লক্ষ্মী বলে মেনে নিতে পারে কি? বোধ হয় না। তাই তো আজও বিয়ের বাজারে কালো মেয়েরা ফর্সা মেয়েদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অনেক পিছিয়ে। দৈনিক পত্রপত্রিকায় পাতাজোড়া পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনে ফর্সা মেয়ের চাহিদা চোখে পড়ার মতো। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, হাঁড়ি, মুচি, ডোম, নাপিত সবারই ফর্সা মেয়ে পছন্দ। উচ্চশিক্ষিত পাত্র যেমন— ডাক্তার, ইনজিনিয়ার, শিক্ষক, অধ্যাপক, বিদেশে কর্মরত উচ্চবেতনভুক চাকুরে কেউ-ই ফর্সার মোহ থেকে আর বেরতে পারছে না।

বিয়ের বাজারে এখনও এভাবেই চলে ফর্সা হওয়ার সুবিধা। একশোটা বিজ্ঞাপনের মধ্যে আটানব্বইটিতেই গৌরবর্ণ মেয়েদের চাহিদা। খোঁজ নিলে হয়তো এও দেখা যাবে চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম। তা হোক, তবু বউ ফর্সা না হলে সমাজে সম্মান থাকবে কী করে? টাকা-পয়সা, বাড়ি-গাড়ি, সোনাদানার ফ্যাসিনেশনের চাপে পড়ে কালো মেয়েদের মানসিক অবস্থা যে কী শোচনীয়, তা দৈনন্দিনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনায় ধরা পড়ে। ভোগবাদী সমাজে ফর্সা হওয়ার জন্য কতই না আড়ম্বর। ক্রিম, পাউডার, বিউটি প্যাকের কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন সমানেই চলছে মানুষের ভিতর-বাহিরে। তাই মাঝে মাঝেই কালো মেয়ে ফিসফিসিয়ে জানান দেয় তাঁর মনের হীনমন্যতা। 'আচ্ছা, এই ক্রিমটা মাখলে কি একটু ফর্সা হওয়া যাবে?' 'আমি তো কালো, আমায় কি এই রং মানাবে?' ---নিজের মধ্যেই প্রতিনিয়ত জেগে ওঠে এমন কত প্রশ্ন।

কবি সেই কোন কালে কৃষ্ণকলিদের রূপের বর্ণনায় বিভোর হয়ে লিখেছিলেন তাঁর কালজয়ী কবিতা। তবে কাব্যে যা সম্ভব তা কি বাস্তবেও সত্যি হতে পারে? তাই তো আজও সমাজে কালো মেয়ের গুণগান সোনার পাথরবাটি ছাড়া আর কিছুই নয়।

ঋতু পরিবর্তনের সময়টিতে সাবধানে থাকুন

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

শীতের পর বসন্তের মনোরম আবহাওয়া ও তারপর গ্রীষ্মের দারুণ গরম ঋতুবৈচিত্র্যের দিক থেকে যতই অভিনব হোক না কেন, কিছু কষ্টদায়ক ব্যাধি এই সময়টিকে ঘিরে রাখে। বসন্তকালে গাছে গাছে ফুলের পরাগ ছাড়ে বলে বাতাসে প্রচুর অ্যালার্জেনের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন ধরনের অ্যালার্জেনের মধ্যে অ্যালার্জিজনিত হাঁপানিরোগের জন্য ফুলের রেণু অন্যতম। সেজন্য এই সময়টিতে অ্যালার্জিক রাইনাইটিস, হে ফিভার ও হাঁপানির সংক্রমণ বৃদ্ধি পায়। বাতাস শুষ্ক থাকে বলে বাতাসে সালফারডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায়। এই সালফারডাই অক্সাইড পরিবেশ দূষণ ঘটায় বলে এই সময়টিতে বিভিন্ন ধরনের শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। যাদের শ্বাসকষ্ট আছে তাদের এসব রোগের হাত থেকে বাঁচতে হলে খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। গ্রামের দিকে এই সময়ে অ্যালার্জিক এলভিওলাইটিস দেখা দেয়। এক জাতীয় ছত্রাকের (এসপারজিলাস ফিউমিগেটাস) দ্বারা এই সমস্যা দেখা দেয় এবং খড়কুটো, গোরুর খাবার ভুসির ব্যবহারের সময় অ্যালার্জেন শ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে ঢুকে অ্যালার্জিক এলভিওলাইটিস রোগের সৃষ্টি করে। এই রোগে হাঁপানির মতো সাঁই সাঁই শব্দ থাকে না এবং এর চিকিৎসা ব্যবস্থাও হাঁপানি রোগ থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। আজকাল পরিবেশে দূষণ মাত্রাতিরিক্ত ভাবে বেড়ে যাচ্ছে, ফলে শিশুরাও এখন ব্যাপকভাবে শ্বাসকষ্টের কবলে পড়ছে। চেম্বারে বসলেই প্রতিদিন একটা সাধারণ দৃশ্য চোখে পড়ে, তা হলো উদ্বিগ্ন মা-বাবা তাদের সন্তানকে কোলে নিয়ে চিকিৎসকের কাছে আসছেন। শিশু শ্বাসকষ্টে ভুগছে। শিশুর জন্য মা-বাবার কী নিদারুণ দুশ্চিন্তা। তাঁরা বারে বারে একটি কথাই জানতে চান, তাঁদের সন্তান সেরে উঠবে তো! বসন্তকালে ভাইরাস জাতীয় কিছু রোগ যেমন, হাম, জলবসন্ত, ভাইরাল ফিভার প্রভৃতি হতে দেখা যায়। এই জ্বরে ঘরের একজন আক্রান্ত হলে ধীরে ধীরে অন্য সদস্যরাও আক্রান্ত হতে শুরু করে। এমন করে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে, এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি —এই চক্রে জড়িয়ে পড়ে।

বসন্তকালে শীতের সময়কার ঘুমন্ত ভাইরাসগুলো একটু গরম বাতাসের মাধ্যমে জেগে উঠে আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে। জলবসন্ত, হাম ভাইরাসজনিত রোগগুলিকে আমরা সংক্রামক ব্যাধি বলি। কারণ এগুলো খুব ছোঁয়াচে। জলবসন্ত তেমন ছোঁয়াচে রোগ নয়, যদিও যার কোনোদিন এই রোগ হয়নি তার কাছে ছোঁয়াচে। সেজন এই রোগ কারও হলে যার কোনোদিন হয়নি তাকে রোগীর কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে। সরাসরি সংস্পর্শে এবং রোগীর হাঁচি-কাশির মধ্য দিয়ে এই রোগ পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে। জলবসন্ত ও হাম হলে রোগীকে কখনোও ঠাণ্ডা লাগানো চলবে না। কারণ এই দুটি রোগেই ঠাণ্ডা লেগে নিউমোনিয়া কিংবা ব্রংকোনিউমোনিয়া দেখা দিতে পারে। হাম-পরবর্তী শিশুর ব্রংকোনিউমোনিয়া প্রাণঘাতী সমস্যায় পরিণত হতে পারে। এখনো আমাদের দেশে একটা ধারণা রয়ে গেছে যে, জলবসন্ত ও হাম হলে তাকে ঠাণ্ডা খাবার খাওয়াতে হবে।

এটা খুব মারাত্মক ধারণা। তাই এ ব্যাপারে সচেতনতা থাকা প্রয়োজন। আর একটি ব্যাপার দেখা যায়, জলবসন্ত ও হাম হলে রোগীকে তার আত্মীয়স্বজন মাছ-মাংস খেতে দেন না। এটাও একটা ভ্রান্ত ধারণা। দুটি রোগেই শরীরে প্রচণ্ড আমিষের ঘাটতি হয়।, তার ওপর যদি তাকে আমিষ থেকে বঞ্চিত করা হয় তাহলে তার মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

মনে রাখতে হবে, রোগীকে পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে। মাছ,মাংস, ডিম, ফল-মূল অবশ্যই দিতে হবে। এতে বসন্তের ঘা পাকবে না। ভাইরাস জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে বসন্তকালে কিছু কিছু টাইফয়েড ও প্যারাটাইফয়েড হতে পারে। ভাইরাস জ্বর হলে সাধারণত একটু যদি কাশি থাকে, তার ওপর থাকে শরীর ব্যথা ও মাথা ব্যথা। তাই এই সময়ের অনাবিল আনন্দের দিনগুলিতে উচিত সাবধানে চলা। মনে রাখতে হবে, প্রতিকার নয়, প্রতিরোধ।

ধাতুগত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় এক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যায়। □

গরমের ব্যারামে আরাম

ভবানী শংকর বাগচি

● গরমকালে শরীরে সোডিয়াম- পটাসিয়ামের পরিমাণ কমে শরীরে নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। যতটা সম্ভব রোদ এড়িয়ে চলুন। সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত সূর্যের তাপ সবচেয়ে বেশি থাকে। ওই সময় ছায়ার নীচে থাকলে গরমের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

● বাড়ির বাইরে বেরোতে হলে একটু সতর্ক থাকুন। শরীরে যেন জলের ঘাটতি না হয়। এই সময়ে প্রচণ্ড ঘাম হয়। এবং ঘামের সঙ্গে অতিরিক্ত লবণও শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। তাই জলের পাশাপাশি শরীরে লবণের ভারসাম্য থাকাটাও জরুরি। এক্ষেত্রে ডাবের জল, চিঁড়ে-মুড়ি ভেজানো জল, নুন-চিনির জল উপকারী।

● তেলমশলা যুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন। এই সময়ে এমন খাবার খাওয়া উচিত যা সহজেই হজম হয়। জলীয় খাবার বা রসালো ফল খেতে পারেন। টক দই খেতে পারেন। রাস্তা-ঘাটের ফ্রুটজুস না খাওয়াই ভালো। এইসব ফ্রুটজুস থেকে পেটে নানারকম ইনফেকশন হতে পারে। রাস্তার ধারে কাটা ফল, মশলাযুক্ত খাবার ও জাঙ্কফুড এড়িয়ে চলুন।

● এই সময়ে গায়ে কোনোরকম তেল বা ময়েশ্চারাইজার না মাখাই ভালো। এতে অ্যালার্জি, র‍্যাশ কিংবা ঘামাচি হতে পারে।

● অনেকের অল্পতেই সর্দি লাগার ধাত থাকে। তাপমাত্রার হেরফেরে নাক বন্ধ, নাক দিয়ে জল পড়ার মতো উপসর্গ থাকলে হালকা ফ্রি হ্যান্ড ব্যায়াম করুন। তাতে শরীর ঝরঝরে থাকবে।

● সুতির জামা পরুন। রোদচশমা, সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন। এতে তাপপ্রবাহ থেকে চোখ ও ত্বক সুরক্ষিত থাকবে। কড়া রোদ থেকে বাঁচতে মাথায় টুপি অথবা ছাতা ব্যবহার করুন। মহিলারা মাথায় ওড়না বা কাপড়ের অংশ ব্যবহার করতে পারেন।

● শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র বা এসির সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হোন। রোদ থেকে ঘেমে নেয়ে এসেই এসি ঘরে ঢুকবেন না। হঠাৎ তাপমাত্রার হেরফেরে সর্দিকাশি বা জ্বরের কবলে পড়তে পারেন। অনেকেই গরমে ১৬ অথবা ১৮ ডিগ্রিতে এসি চালান। এটা স্বাস্থ্যসম্মত নয়, এসির তাপমাত্রা অন্তত ২৪ ডিগ্রির উপরে থাকা উচিত।

● গরমে নবজাতকদের দিকে বাড়তি নজর দেওয়া উচিত। এই সময়ে সদ্যোজাত শিশুদের ক্ষেত্রে ডিহাইড্রেশন, জ্বর, অ্যালার্জিক র‍্যাশ, ডায়ারিয়া বা অন্যান্য পেটের সমস্যার মতো ইনফেকশন এবং তা থেকে অসুখ হতে পারে। গরমে শিশুদের পরিচ্ছন্ন রাখার দিকে কড়া নজর দিতে হবে। হালকা, পাতলা ও আরামদায়ক সুতির পোশাক পরানো উচিত। মশার উপদ্রব বেশি হলে বাচ্চার হাত-পা সুতির কাপড়ে ঢেকে রাখা ভালো।

● গরমে ত্বকের সমস্যা একটি সাধারণ ব্যাপার। শতকরা ৬০ ভাগ মানুষেরই এই সময় ঘামাচির সমস্যা দেখা দেয়। অতিরিক্ত ঘাম শরীরে শুকিয়ে গেলে, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও ধুলোবালির মধ্যে বেশিক্ষণ থাকলে ত্বকে সমস্যা দেখা দেয়। ঘামাচি, সামার বয়েলের (ছোটো লাল দানার মতো গোটা) মতো ত্বকের সমস্যা গরমকালে বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

● অতিরিক্ত ঘামের কারণে শরীরে হঠাৎ জলশূন্যতা দেখা দিতে পারে। এর ফলে রক্তশূন্যতা, দুর্বলতা, মাংসপেশিতে ব্যথা, মাথা ঘোরা, পেট ব্যথার মতো রোগ দেখা দিতে পারে। এজন্য অত্যধিক তাপমাত্রায় বা রোদে দীর্ঘ সময় কাজ করা যাবে না। বেশি করে জল এবং তরলজাতীয় খাবার খেলে শারীরিক অবসাদ জনিত সমস্যা দূর হয়।

● গরমের সময় যতটা পারেন চা-কফি ও অন্যান্য হার্ড ড্রিংকস নেওয়া কমিয়ে দিন। কারণ এর ফলে শরীরের মেটাবলিজম কমে যায়।

● গরমে লু বা তাপপ্রবাহ যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলুন। অত্যধিক তাপ প্রবাহের ফলে হিটস্ট্রোকের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। লু লাগলে বেলের শরবত, লেবু জল, পোড়া আমের শরবত বা আম পান্না খেলে উপকার পাওয়া যায়। এই সময় বাইরে বেরোলে সঙ্গে একটা জলের বোতল রাখুন। জলে গ্লুকোজ বা লেবু মিশিয়ে খেতে পারেন।

গ্রীষ্মকাল এসে গেছে। এইসময় বাড়ির বাচ্চা তো বটেই, বয়স্করাও নানারকম অসুখ-বিসুখে ভোগেন। প্রচণ্ড দাবদাহে সাধারণ সর্দিকাশি, জ্বর, পেটের গোলমাল, বিভিন্ন চর্মরোগ থেকে শুরু করে সানস্ট্রোক পর্যন্ত হতে পারে। এই সময় খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দিতে হবে এবং প্রখর রোদ্দুরে বাড়ির বাইরে বেরোনো নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এই সময়ে খুব সাধারণ খাবার রাখবেন আপনার খাবারের তালিকায়। তেল-ঝাল-মশলাদার খাবার এড়িয়ে চলাই ভালো। কেননা এই ধরনের খাবারে আমাদের পরিপাক যন্ত্রের ওপর কিন্তু একটা চাপ পড়ে। আর সেটা এই গরমকালে আমাদের শরীরের পক্ষে খুব একটা সুখকর নয়।

গরমকালে ছাতা ছাড়া বাইরে বেরোবেন না

ডাঃ অরিন্দম বিশ্বাস

শুরুতেই একটি কথা বলে নিতে চাই। আমরা গত দু' বছরে এক ভয়ংকর লড়াই লড়েছি। আর সেই লড়াইতে প্রায় জয়ীও হতে পেরেছি বলা যায়। হ্যাঁ, আমি করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথাই বলছি। এই যুদ্ধে আমরা বহু করোনা যোদ্ধাকে হারিয়েছি। চিরতরে বিদায় জানাতে বাধ্য হয়েছি আমাদের অতি প্রিয়জন থেকে কাছের বন্ধুকেও। তবুও আমরা লড়ে গেছি। অবশেষে পুরোপুরি বলব না, জয় একটা এসেছে। অবশ্য এটা মনে করলে চলবে না যে করোনা একেবারেই বিদায় নিয়েছে। সম্প্রতি নতুন একটা ভ্যারিয়েন্টের সন্ধান নাকি পাওয়া গেছে। মুম্বাইতে। এই ভ্যারিয়েন্টের নাম এক্সই। আমরা ইতিমধ্যেই ওমিক্রন নামের একটি ভ্যারিয়েন্টকে পেয়েছি। আমরা ধীরে ধীরে অনেকটাই নিজেদের শক্তিশালী করে ফেলছি। ভ্যাকসিন ও করোনার নানারকম স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিজেদের একটি করোনা প্রতিরোধী শক্তিশালী বর্ম পরিয়েছি। যে বর্ম আমাদের রক্ষা করছে করোনার সংক্রমণ থেকে। ভবিষ্যতে এই করোনা ভাইরাস একেবারে মুছে যাবে না। এর উপস্থিতি থাকবেই আমাদের মধ্যে, ওই সামান্য সর্দি, জ্বর হিসেবে। অনেকে হয়তো ভাবছেন, করোনা স্বাস্থ্যবিধি আর মেনে লাভ কী? আমি বলব, সামান্য মাস্ক আর স্যানিটাইজার ব্যবহার করলে যখন এই রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, তাহলে আর কিছুদিন পরেই থাকি না। অন্তত নিজেদের স্বার্থে।

এবার আসি অন্য একটি সাম্প্রতিক বিষয়ে। আসন্ন গ্রীষ্মের ঋতুতে

কেমন ভাবে নিজেকে রাখব? কীভাবে নিজেকে রক্ষা করব সব রকম রোগের প্রাদুর্ভাব থেকে?

গ্রীষ্মকালে অনেক রোগের মুখোমুখি হবার সম্ভাবনা থাকে। কেননা গরমে আমাদের শারীরবৃত্তীয় বেশ কিছুটা অস্বস্তিদায়ক ঘটনা ঘটতে থাকে। যেমন একটা সমস্যার কথা প্রথমেই উল্লেখ করতে চাই। সেটা হলো ডিহাইড্রেশনের সমস্যা। এই সমস্যাটা আমাদের প্রত্যেকের কাছে অনেকটাই প্রকট হয়ে ওঠে এই সময়। এর থেকে শরীরে দেখা দিতে পারে নানা রকম অস্বাভাবিকতা। এই সমস্যা থেকে একমাত্র মুক্তির উপায়টি রয়েছে আমাদের হাতেই। সেটি আর কিছুই নয়, প্রচুর পরিমাণে জল খাওয়া। আর অবশ্যই মনে রাখবেন, সেই জলে যেন থাকে আমাদের শরীরের জন্য অতি প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থগুলি। মনে রাখতে হবে আরও একটি বিষয়, শরীরের মধ্যে যেন এই জলের মাধ্যমে পটাসিয়াম ক্লোরাইড ঢুকতে পারে। কেননা এই গরমের সময়ে আমরা যখন গলদঘর্ম হই, মানে একেবারে ঘেমে-নেয়ে একশেষ হয়ে যাই, সেই সময় আমাদের শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে এই খনিজ পদার্থটি বেরিয়ে যায়। এর কারণে শরীরে একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। আর সেই কারণেই দরকার খনিজ পদার্থ যুক্ত জল পান করা। বাড়িতে তৈরি ওআরএস-এর মধ্যে দিয়ে পাওয়া যেতে পারে বা শরবতের মধ্যে দিয়ে পাওয়া যেতে পারে। আবার বাড়িতে তৈরি বিভিন্ন ফলের রস আপনাকে ডিহাইড্রেশন সমস্যা থেকে রক্ষা করতে পারে। অনেকে আবার দোকানে রাখা ঠাণ্ডা পানীয়ের কথা বলবেন। এই ঠাণ্ডা পানীয়গুলি খুব একটা তেষ্টা যেমন মেটায় না, তেমনি পারে না ডিহাইড্রেশনের সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে। একটি কথা মনে রাখবেন, বিশেষ করে একটু বয়েস হয়েছে যাদের আর যারা ছোটো তাঁদের জন্যও একই কথা। এই সময়ে রোদের মধ্যে একনাগাড়ে অনেকক্ষণ কাজ করবেন না বা কাজ করার চেষ্টা করবেন না। কাজ করতে বারণ করছি না। তবে একনাগাড়ে কাজ করতে বারণ করছি। অল্প সময় কাজ করুন। থামুন, রোদ থেকে সরে যান, কিছুটা সময় ছায়ায় থাকুন, আবার কাজ করুন। যাদের বাইরে বেরতে হয়, রোদে-রোদে রাস্তায় ঘুরে কাজ করতে হয়, তাঁদের বলি, ছাতা ব্যবহার করুন। এই রোদ থেকে নানা তাৎক্ষণিক সমস্যা দেখা দিতেই পারে। যেমন গাব্যথা, মাথাব্যথার মতো সমস্যা। এছাড়াও ঘাম বেরিয়ে শরীরে একটা হিট এক্সজরসন হয়। সেটা থেকে শরীর বেসামাল হয়ে পড়ে। প্রচণ্ড ঘাম হতে পারে, মাথা ঘুরতে পারে, শরীরটা আইঢাই করতে থাকে। আমরা একেবারে বেসামাল হয়ে পড়ি। এক্ষেত্রে আবারো বলব, ছাতা মাথায় দিতেই হবে আর জল পান করতে হবে প্রচুর। আর অতিরিক্ত কাজ করবেন না রোদের নীচে বা রোদের মধ্যে। যতটা পারবেন করবেন। একটু বাড়াবাড়ি হলেই কিন্তু আপনার শরীরে নেতিবাচক প্রভাব পড়বেই। একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলতেই হচ্ছে, মাথা ঘোরা, বা গা ব্যাথার সঙ্গে কিন্তু হিট ক্র্যাম্প হতে পারে। এই গরমকালে আবার হিট স্ট্রোকের একটি বিষয় থাকে। যদিও আমাদের পরিবেশে সেই আশঙ্কা খুব কম। তবে আমাদের রাজ্যে যে ভাবে মাঝে মাঝে দাবদাহ বা তাপপ্রবাহ চলে, সেক্ষেত্রে এই হিট স্ট্রোকের সম্ভাবনা যে একেবারেই নেই, সেটা বলা যাবে না।

এই গরমের সময়ে খাওয়া দাওয়া করার ক্ষেত্রে একটা নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে। এই সময়ে খুব সাধারণ খাবার রাখবেন আপনার খাবারের তালিকায়। তেল-ঝাল-মশলাদার খাবার এড়িয়ে চলাই ভালো। কেননা এই ধরনের খাবারে আমাদের পরিপাক যন্ত্রের ওপর কিন্তু একটা চাপ পড়ে। আর সেটা এই গরমকালে আমাদের শরীরের পক্ষে খুব একটা সুখকর নয়।

সবশেষে বলি, নিজের শরীরকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিজের। আপনি যে ভাবে চলবেন, শরীর আপনার সঙ্গ দেবে সেভাবেই। আর শরীরে এই সময়ে যদি কোনোরকম অস্বাভাবিকতা দেখা দেয় তাহলে, অবশ্যই একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। নিজের চিকিৎসা নিজে করার ঝুঁকি নেবেন না। ■

সানস্ট্রোক থেকে বাঁচার উপায়

সান স্ট্রোক বা হিট স্ট্রোক কী?

অত্যধিক গরম এবং আর্দ্র পরিবেশে দীর্ঘ সময় ধরে থাকলে অথবা এ ধরনের পরিবেশে বেশিক্ষণ কাজ করলে শরীর অনেক সময় তাপের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। যার জন্য দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এবং এক সময় তা ১০৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট ছাড়িয়ে গেলে তাকে সান স্ট্রোক বা হিট স্ট্রোক বলা হয়।

সানস্ট্রোকের উপসর্গ

চিকিৎসকদের মতে, অনেকেই বুঝতে পারেন না যে তিনি সান স্ট্রোক বা হিট স্ট্রোকের শিকার। অথচ অনেক সময় শরীরে এর প্রভাব মারাত্মক হতে পারে। তা থেকে বড়সড় ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই জেনে রাখা দরকার কোন্ কোন্ উপসর্গ দেখলে বোঝা যাবে আপনি সানস্ট্রোকের শিকার--

১। কাঠফাটা রোদে বেরিয়ে যদি দেখেন হঠাৎ মাথা ঘুরছে, তাহলে সাবধান হোন। এটি সানস্ট্রোকের প্রাথমিক ইঙ্গিত হতে পারে। আর যদি দেখেন বমি বমি ভাব আসছে বা বমি হচ্ছে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

২। ভ্যাপসা গরমে চলতে ফিরতে যদি শরীর, পেশী, হাত- পা অবশ হয়ে আসে তবে বুঝতে হবে লু লেগে সানস্ট্রোকের শিকার হয়েছেন। দেরি না করে চিকিৎসকের কাছে যান।

৩। রোদে হাঁটতে হাঁটতে যদি দেখেন শরীরের তাপমাত্রা হঠাৎ অনেকটা বেড়ে গিয়েছে, গরমে গা পুড়ে যাচ্ছে, তাহলে ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ান। রোদ এড়ানোর চেষ্টা করুন। চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিন। নইলে আপনি সানস্ট্রোকের শিকার হতে পারেন।

৪। সানস্ট্রোক হলে অনেক সময় ত্বক লাল হয়ে যায়। সাময়িকভাবে ত্বকে একটা জ্বালা জ্বালা ভাব আসে। অনেকের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত গরমে অ্যালার্জিজনিত র‍্যাশ বেরিয়ে গায়ে চাকা চাকা দাগ হয়ে যায়। এ ধরনের লক্ষণ দেখলে সাবধান হতে হবে। সানস্ট্রোকে চামড়ায় টান ধরে। এই অবস্থায় দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

৫। সানস্ট্রোকের আগে অনেক সময় খুব ঘাম হয়। গরমে ঘাম হওয়াটা স্বাভাবিক। তাই সানস্ট্রোকের অতিরিক্ত ঘামের উপসর্গকে আমরা গুরুত্ব দিই না। সানস্ট্রোক হলে এক সময় ঘাম হওয়া হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। তেমন হলে সতর্ক হওয়া উচিত ও চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া দরকার।

৬। সানস্ট্রোক হলে অনেকেই হঠাৎ চোখে আবছা দেখেন। অথবা চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে যায়। যাকে সাধারণত ব্ল্যাক আউট বলে . ।এমন হলে অবহেলা না করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত।

সানস্ট্রোক থেকে বাঁচতে যা করবেন

১। যাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে তারা যতটা সম্ভব রোদ এড়িয়ে চলুন। খুব প্রয়োজন ছাড়া রোদে বেরোবেন না।

২।এই গরমে সঙ্গী হোক জলের বোতল, ছাতা ও রোদচশমা। তাতে কিছুটা হলেও সানস্ট্রোকের ঝুঁকি এড়ানো যাবে।

৩। তরমুজ, ফুটি, শশা, পুদিনাপাতা, লাউ, কুমড়ো, করলা প্রভৃতি হাইড্রেট জাতীয় জলীয় খাবার রোজকার তালিকায় রাখুন।

৪। প্রখর রোদ থেকে বাঁচতে ত্বকে সানস্কিন ব্যবহার করতে পারেন।

৫। নিজের প্রয়োজনীয় ওষুধ সঙ্গে নিয়ে বেরোন। ব্যাগে ওয়েট ওয়াইপস বা ভিজে টিস্যু রাখতে পারেন। খুব গরম লাগলে তা দিয়ে মুখ, ঘাড় ও কানের পিছনের দিক মুছে নিলে অনেকটা আরাম পাওয়া যাবে।

৬। রোদের মধ্যে পার্ক করা গাড়িতে বসে থাকবেন না।

৭। কাঁচা পেঁয়াজ সঙ্গে রাখুন। অতিরিক্ত লু লাগলে কাঁচা পেঁয়াজ চিবিয়ে খান। অনেকে মুখে গন্ধ হওয়ার কারণে কাঁচা পেঁয়াজ খেতে চান না। কিন্তু রোদের প্রকোপ থেকে বাঁচতে পেঁয়াজ হলো মোক্ষম দাওয়াই। ভারতের অধিক উষ্ণপ্রবণ অঞ্চলগুলিতে গরমকালে পেঁয়াজ সেদ্ধ করে খাওয়ার চল আছে। ▮

গরমে বাচ্চাদের রোদে বেশি বেরোতে দেবেন না

তেল মশলাযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন। শিশু হাজার বায়না করলেও এই সময়ে কাটা ফল বা বাইরের খাবার এড়িয়ে চলুন।

ডাঃ সুশান্ত মিত্র

প্রথমে শীত, তার পরে বসন্ত পেরিয়ে গরমকাল— এক একটি ঋতুর সন্ধিক্ষণ পেরিয়ে আমরা এগিয়ে যাই। ঋতুচক্রের সঙ্গে আমাদের শারীরবৃত্তীয় নানা কাজও এগিয়ে চলে। শরীর মানিয়ে চলে ঋতু চক্রের নানা প্রভাব। এই প্রভাবের ফলে আমাদের শরীর নানা সমস্যার মুখোমুখি হয়। এই সমস্যা বড়োরা একটু হলেও সামলে নিতে পারে। কিন্তু ছোটোরা? তারাতো পারে না নিজেদের শরীরের কষ্টের কথা বলতে। তাই সেই কষ্ট যাতে এই গরমকালে আমাদের সন্তানদের না সইতে হয়, সেই সম্পর্কে একটু বলি।

একেবারে দুধের শিশু থেকে শুরু করে কিশোরদের নিয়ে আমি বলব। যারা এই সময়ে অনেকটাই বেসামাল হয়ে পড়ে। এই বেসামাল হবার একটাই কারণ। ঠাণ্ডা আর গরমের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে একরকমের সমস্যা হয়, অন্যদিকে প্রবল গরমের মধ্যে পড়ে আরেক ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়ে তারা। এই সমস্যার কারণ একটাই, এই বয়েসটাতে আপনার সন্তানের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়। এই সময়েই ঘটতে পারে নানা বিপত্তি। তার মধ্যে একটি উল্লেখ করার মতো বিষয় হলো ঠাণ্ডা লাগা। এই সময়ে ঠাণ্ডা জিনিস যেমন আইসক্রিম বা কোল্ড ড্রিংক খাবার একটা প্রবণতা দেখা যায়, তেমনি দেখা যায় বাড়িতে ফ্রিজে রাখা ঠাণ্ডা জল খাবার ইচ্ছা। গরমে খেলে এসে বা দৌড়াদৌড়ি করে এসেই বাড়িতে ঠাণ্ডা জল বা আইসক্রিম খায়, অথবা রাস্তাতেই নানারকম ঠাণ্ডা জিনিস খায়। এতেই বিপত্তি দেখা দেয়। ঠাণ্ডা লেগে যায় খুব সহজেই। নানারকম সমস্যা দেখা দেয় এই ঠাণ্ডা লাগা থেকেই। আমি এই ক্ষেত্রে বলব যতটা সম্ভব পারা যায় আপনার সন্তানকে রোদের তাপ থেকে বাঁচিয়ে চলুন। বেলা দশটার পর রোদের তেজ খুব বাড়তে থাকে গরমকালে। তাই এই সময়টাকে মাথায় রেখেই এগোতে হবে।

রোদে বেশি বেরোতে না দিলে অনেকটাই রক্ষাকবচ দিতে পারবেন আপনার সন্তানকে। বিশেষ করে সানস্ট্রোক থেকে রক্ষা করতে পারবেন আপনার শিশুকে। এই গরমে হঠাৎ করে

ডাঃ প্রশান্ত সুকুল
চেস্ট ফিজিসিয়ান
(মোবাইল নং-৯৯৩২৭৬৬৭৬৫)

আমাদের শরীরে প্রতিনিয়ত শ্বাসপ্রশ্বাস, সংবহন, রেচনের মতো জৈবিক ক্রিয়াগুলি চলছে। যে কারণে শরীরে ইনসেন্সিবল ওয়াটার লস হয়। গরমে এই ঘাটতির পরিমাণ আরও বেশি হয়। এই সময় একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির প্রতিদিন তিন লিটার জল খাওয়া উচিত। সঙ্গে ভিটামিন সি, সাইট্রাস বা টক জাতীয় ফল খেতে হবে। খাদ্যতালিকায় ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার থাকা আবশ্যিক। ক্যালসিয়ামে অ্যালার্জির প্রকোপ কমে। গ্রীষ্ম ঋতুতে যতটা সম্ভব শরীর ঠাণ্ডা রাখতে হবে। ধূমপান না করাই ভালো। তেল, মশলাযুক্ত খাবার এই সময় যত কম খাবেন ততই মঙ্গল। সেদ্ধ খাবার খাওয়ার অভ্যাস বাড়াতে হবে। তেল, মশলাযুক্ত খাবার শরীরের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয়। সকালবেলায় খালিপেটে দশটি তুলসীপাতা চিবিয়ে খান। এটা ন্যাচারাল ইমিউনিটি বুস্টার হিসেবে কাজ করে।

ঠাণ্ডা লেগে যায় নানা কারণে, সেকথা আগেই বলেছি। এই ঠাণ্ডা লাগার পিছনে থাকে আরেকটি কারণ, সেটি হচ্ছে অ্যালার্জি। এই অ্যালার্জি থেকেই হাঁচি, কাশি, সর্দি, বুকে সংক্রমণ থেকে নানা উপসর্গ দেখা দিতে পারে আপনার সন্তানের শরীরে। প্রখর রৌদ্র বা গরম থেকে এসে ঠাণ্ডা জিনিস খেলেই এই অ্যালার্জি দেখা দিতে পারে। তাই এটাকেও এড়িয়ে চলতে শেখাবেন শিশুকে। আমি বলছি না যে আইসক্রিম বা ঠাণ্ডা পানীয় খাবে না। তবে একেবারে সাধারণ তাপমাত্রায় সন্তানকে রেখে, স্বাভাবিক করে তারপর দিন এইসব খাবার।

এখন আমারা অনেকে গরম থেকে বাঁচতে বাড়িতেই এসি ব্যবহার করে থাকি। আর আমাদের সন্তানরা গরম থেকে এসেই সেই ঘরে ঢুকে পড়ে। এর থেকেও ঠাণ্ডা লেগে নানা উপসর্গ দেখা দিতে পারে। তাই এই বিষয়টাতেও একটু লক্ষ্য রাখবেন।

গরমকালে শিশুদের ডিহাইড্রেশনের সমস্যা দেখা দেয়। অল্প নুন ও চিনি দিয়ে বাড়িতে স্যালাইন জল বানান। দিন আপনার সন্তানকে। আর পেটের নানা রোগ থেকে বাঁচতে দিন হালকা খাবার। তেল মশলাযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন। এই সময়ে হাজার বায়না করলেও কাটা ফল বা বাইরের খাবার এড়িয়ে চলুন। সব শেষে বলি শিশু বা সন্তানকে বেশি করে জল খাওয়াবেন। জলই রক্ষা করবে আপনার সন্তানকে। যদি আপনার শিশুর শরীরের মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা দেখেন, তাহলে কোনো অবহেলা না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। ▯

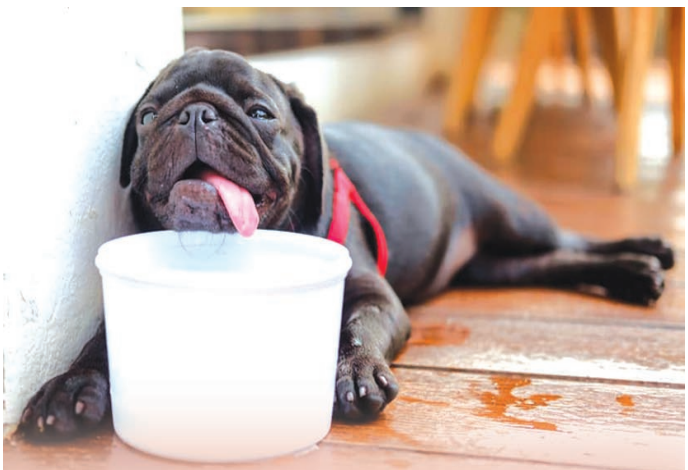

গরমে সুস্থ থাকুক পোষ্য

১। গ্রীষ্মকালে প্রাণীদের খাদ্যাভ্যাস বদলের প্রয়োজন হয়। এই সময় পোষ্যদের অতিরিক্ত খাবার দেবেন না। বাসি খাবার যেন না খায়। খোলা জায়গায় পড়ে থাকা খাবারে যেন মুখ না দেয় সেদিকে নজর দিন।

২। প্রচণ্ড গরমে মানুষের মতো পোষ্যদেরও হাইড্রেটেড থাকা জরুরি। বাড়িতে ও বাড়ির বাইরে সব সময় পোষ্যের জল খাবার পাত্রটি জলভর্তি করে রেখে দিন।

৩। খুব সহজে হজম হয় এমন খাবার দিন। এই সময় ওদের তরমুজ দেওয়া যেতে পারে। গরমে বেশিরভাগ কুকুরই পেটের সমস্যায় ভোগে। ডাবের জলের সঙ্গে আদা কুচি মিশিয়ে দিলে ওদের পেট ভালো থাকে।

৪। প্রচণ্ড গরমে ওরা ঠাণ্ডা হাওয়ায় মেঝেতে শুয়ে থাকতে পছন্দ করে। বেশ কিছু পোষ্য কাছেপিঠে থাকা পাত্র থেকে জল ফেলে তার উপর শুয়ে থাকতে পছন্দ করে। ওদের ওভাবেই থাকতে দিন। দেহের তাপমাত্রায় ভারসাম্য আনার জন্যই ওরা এমনটা করে।

৫। এই সময়ে ছাদে বা উঠোনে একটা ছোট পাত্রে কাক-পাখিদের জন্য জল ভর্তি করে রাখুন।

ডাঃ প্রশান্ত দত্ত,
হোমিওপ্যাথি
কনসালট্যান্ট,
মোবাইল নং-
৭০০১৭২৬৩৭৩

কারও সানস্ট্রোক বা হিটস্ট্রোক হলে তাঁকে ঠাণ্ডা জায়গায় বসিয়ে দিন। তারপর ভিজে কাপড় দিয়ে গা- হাত-পা মুছিয়ে দিতে হবে। হোমিওপ্যাথিতে গ্লোনইন ৩০ (GLONOINE 30) ওষুধ আছে। তার তিন ফোঁটা খাইয়ে দিতে হবে। সানস্ট্রোকে ওষুধটা খুব ভালো কাজ করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই রোগী সুস্থ বোধ করেন। রোদের মধ্যে একটানা দীর্ঘক্ষণ কাজ করবেন না। এতে সানস্ট্রোকের ঝুঁকি এড়ানো যাবে। শরীর যাতে ডিহাইড্রেটেড না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এই সময় জলবসন্ত'র মতো সংক্রামক রোগের প্রকোপ বাড়ে। বাড়িতে বা বাড়ির বাইরে পড়শিদের যদি কারও জলবসন্ত হয়, তাহলে প্রিভেন্টিভ মেডিসিন নিতে পারেন। ভেরিওলিনামের (VARIOLINUM) মতো কিছু ওষুধ আছে যেগুলো আগে থেকে নিলে জলবসন্ত'র মতো রোগ এড়ানো যায়। তবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ মতো সঠিক মাত্রার ওষুধ খাওয়া বাঞ্ছনীয়।

গরমে প্রতিদিনের ডায়েটে টক দই অবশ্যই রাখুন

ত্রিয়া সিংহ
পুষ্টিবিদ

অনীক স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পর হঠাৎ করেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তার মা তাকে গ্লুকোজ জল দেয়। কিছুক্ষণ পর সে ধীরে ধীরে সুস্থবোধ করে। অনীকের মতো এরকম অনেকেই গরমের দাবদাহে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। আমরা জানি যে বছরের উষ্ণতম ঋতু গ্রীষ্মকাল। এই সময় সূর্যের তাপমাত্রা এতই প্রখর হয় যে দিনেরবেলা চলাচল দুষ্কর হয়ে ওঠে। গ্রীষ্মকালে বাতাস হয় শুষ্ক। তাই বার বার তেষ্টা পায়। এই সময় প্রধান যে সমস্যাটি লক্ষ্য করা যায় সেটি হলো ডিহাইড্রেশন। সাধারণত প্রস্রাব ও ঘামের মাধ্যমে জল শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। তাই ডিহাইড্রেশন রোধ করতে আমাদের প্রচুর পরিমাণে জল পান করা দরকার। আমরা ডিহাইড্রেশনের শিকার কিনা তা বোঝার জন্য কয়েকটি জিনিস লক্ষ্য করতে হবে— ১. জল তেষ্টা পাওয়া, ২. মুখ ও ঠোঁট শুকিয়ে যাওয়া, ৩. শুষ্কবোধ, ৪. মাথার যন্ত্রণা, ৫. প্রস্রাব গাঢ় ও হলুদ হওয়া, ৬. সারাদিনে খুব কম পরিমাণে প্রস্রাব হওয়া।

যখন আমাদের শরীর ডিহাইড্রেটেড থাকে, দেহের সমতা বজায় রাখার জন্য আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে তরল পানীয় গ্রহণ করতে হবে। এছাড়াও ঋতুকালীন শাকসবজি ও ফল বেশি করে খেতে হবে। এই সময় বাচ্চাদের খাদ্যতালিকার ওপর খেয়াল রাখা উচিত। সদ্যোজাত বা ছ'মাস পর্যন্ত শিশু মাতৃদুগ্ধ পান করবে, এই সময় প্রয়োজন অনুসারে মাতৃদুগ্ধ পান করাতে হবে। বাচ্চাদের খাদ্যতালিকায় সেই সমস্ত খাবার রাখতে হবে যেগুলি শরীরকে ঠাণ্ডা রাখে।

দই : এই সময়ের সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর ও উপকারী খাবার হলো দই। দই হলো Probiotic, এর মধ্যে উপকারী ব্যাকটেরিয়া থাকে যা তাপ নিরাময়কারী হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও এটি শরীরকে hydrated রাখতে এবং শক্তিবর্ধক হিসেবে কাজ করে। দইয়ের সঙ্গে সামান্য লবণ মিশিয়ে বিভিন্ন ধরনের পদ বানিয়ে খাওয়া যেতে পারে। যেমন— লস্যি, রায়তা ইত্যাদি। এই ধরনের পানীয় বাচ্চা ও বড়ো উভয়ের পক্ষেই উপকারী। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে জলখাবারে দই চিড়ে, দুপুরে দই ভাত দেওয়া যেতে পারে। বড়োদের ক্ষেত্রে প্রত্যহ খাদ্য তালিকায় টকদই রাখা আবশ্যক।

শরবত : ছাতুর শরবত হলো গ্রীষ্মকালের অন্যতম পানীয়। ছাতু হলো প্রোটিনযুক্ত খাদ্য যা আমাদের শক্তি

প্রদান করে। এছাড়াও এই পানীয় আমাদের শরীরকে ঠাণ্ডা ও hydrated রাখতে সাহায্য করে এবং হজমে সাহায্য করে। শিশু, প্রাপ্তবয়স্ক, বৃদ্ধ সকলেই এই পানীয় খাদ্য তালিকায় রাখতে পারেন। এছাড়াও ডায়েবেটিস রোগীর ক্ষেত্রে ছাতুর শরবত খুবই উপকারী।

ডাবের জল : গরমকালে আমাদের শরীর থেকে ঘামের সঙ্গে বহু Electrolytes বেরিয়ে যায়। তাই এই জলসমতা বজায় রাখার জন্যে ডাবের জল খুবই উপকারী। ডাবের জলে প্রচুর পরিমাণে ইলেকট্রোলাইট থাকে। এটি শরীরকে সতেজ রাখে। শিশু ও বয়স্ক উভয়ের ক্ষেত্রেই এটি অত্যন্ত উপকারী।

শশা : গ্রীষ্মকালের আরেকটি অন্যতম খাবার হলো শশা। শশায় প্রায় ৯৫ শতাংশ জল রয়েছে, যা আমাদের শরীরে জলের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। এটি ক্ষারীয় হওয়ার কারণে শরীরে পিএইচ ব্যালেন্স নিয়ন্ত্রণে রাখে। এছাড়াও শশা শরীরের সমস্ত টক্সিন দূর করে। তাই শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্কদের খাদ্য তালিকায় শশা অবশ্যই রাখা উচিত। যে সকল শিশু চিবিয়ে খেতে পারে না, তাদের ক্ষেত্রে শশার রস অথবা কুরিয়ে খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

লাউ : লাউ বেশিরভাগ মানুষই অপছন্দ করেন। কিন্তু লাউয়ের মধ্যে আছে বেশকিছু গুণ। লাউয়ে প্রায় ৭০ শতাংশ জল থাকে। এটি কম ক্যালোরিযুক্ত, কম ফ্যাটযুক্ত, উচ্চ তন্তুযুক্ত এবং এতে ভিটামিন সি, রাইবোফ্ল্যাবিন, জিঙ্ক, সায়ানিন, আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজ থাকে। শরীরে জলের অভাব মেটাতে এটি একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য। এছাড়াও এটি শরীর থেকে টক্সিক বা বিষাক্ত পদার্থ নষ্ট করে এবং শরীরে জলীয় পদার্থ যুক্ত করে। লাউয়ের শাঁস পেট ঠাণ্ডা রাখে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে এবং হজমে সাহায্য করে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে লাউয়ের রস অথবা সবজি হিসেবেও দেওয়া যেতে পারে।

তরমুজ : তরমুজ হলো গ্রীষ্মকালের একটি অন্যতম প্রধান ফল। তরমুজে প্রায় ৭২ শতাংশ জল থাকে। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও খনিজ লবণ থাকে। এতে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট থাকে যা কোষগুলিকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে। এটি একটি ক্যান্সার প্রতিরোধকারী খাদ্য। এই গরমে তরমুজের রস অথবা বীজ ছাড়িয়ে ছোটো ছোটো টুকরো করে খাওয়ানো যেতে পারে।

আম : ফলের রাজা হলো আম। এই সময় আমের শরবত খুবই উপকারী। এটি শরীর থেকে অতিরিক্ত সোডিয়াম ক্লোরাইড ও আয়রন বেরিয়ে যাওয়া রোধ করে। এছাড়াও ঘামাচি প্রতিরোধে সাহায্য করে। পাকা আম দৈনিক খাদ্য তালিকায় রাখতে হবে। আম হলো ভিটামিন এ,কে,সি, বিটা-ক্যারোটিন পটাশিয়াম, ফলেট ইত্যাদির উৎস। যা এই সময় আমাদের দেহের ইলেকট্রোলাইট সমতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। কিন্তু এটি মাঝারি মাত্রায় গ্রহণ করা উচিত। কারণ বেশি মাত্রায় গ্রহণ করার ফলে উদরাময়, পেট ব্যথা ইত্যাদি দেখা যেতে পারে। এছাড়াও আমে ক্যালোরির পরিমাণ বেশি থাকায় এটি ওজন বাড়াতে সাহায্য করে ও মধুমেহ রোগীদের ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক হতে পারে।

পেঁয়াজ : গ্রীষ্মের মরসুমে হিটস্ট্রোক এড়াতে খাদ্য তালিকায় পেঁয়াজ অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। কাঁচা পেয়াজের শীতল প্রভাব রয়েছে। গরমে পেঁয়াজ খেলে শরীর অনেক ঠাণ্ডা থাকে। এছাড়াও পেঁয়াজে আছে quercetin নামক যৌগ, যা অতিরিক্ত গরমে ত্বকের ওপর র‍্যাশ বেরোনোকে প্রতিরোধ করে। পেঁয়াজের মধ্যে অ্যান্টিমাইকোবিয়াল, অ্যান্টিসেপটিক এবং অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাই শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক উভয়ের খাদ্য তালিকায় পেঁয়াজ অতি অবশ্যই রাখা উচিত।

মিছরির শরবত : গ্রীষ্মকালের অন্যতম পানীয় হলো মিছরির শরবত। এটি মন ও শরীর উভয়ের ওপর একটা শীতল প্রভাব ফেলে। মিছরি হলো চিনির অপরিশোধিত রূপ। এটি শরীরে তাৎক্ষণিক শক্তি প্রদান করে। শরীর যদি ভেতর থেকে অত্যধিক শুষ্ক হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে নাক দিয়ে রক্ত পড়ার মতো সমস্যা ছোটো-বড়ো অনেকেরই দেখা যায়। এই সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে একটি উপকারী পানীয় হিসেবে মিছরির শরবত অদ্বিতীয়। মূলত দেহের তাপমাত্রা হঠাৎ বেড়ে যাওয়ার কারণে এই সমস্যা দেখা যায়। মিছরির জল শরীরকে ভেতর থেকে ঠাণ্ডা রাখতে এবং তাপের প্রভাবগুলি দূরে রাখতে সাহায্য করে।

বেল : আমরা বাজারে অনেক ফলই কিনে থাকি কিন্তু একটি জিনিস আমরা তেমন কিনি না, সেটি হলো বেল। গরমে শরীরকে ঠিক রাখতে বেলের শরবতের জুড়ি মেলা ভার। বেলে আছে ক্যারোটিন, রাইবোফ্ল্যাভিন, ভিটামিন-সি, সায়ানিন, নায়াসিন ভিটামিন-বি, ভিটামিনট বি$_{৬}$ ইত্যাদি। এছাড়াও কিছু খনিজ লবণ যেমন, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম ইত্যাদি। বেলে আছে প্রচুর পরিমাণে তন্তু, কাঁচা ও পাকা বেল দুই-ই সমান উপকারী। বেলের শরবত গরমে শরীর ঠাণ্ডা রাখতে ও হজমশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। এছাড়াও এটি কোষ্ঠকাঠিন্য নিরাময় ও আমাশয় দূরীকরণে সাহায্য করে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বেলের শরবত শক্তিবর্ধক হিসেবে কাজ করে।

তবে বেশ কিছু খাবার আছে যেগুলি এই গরমে মেনে চলা উচিত। গরমকালে আমাদের হজম ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে কম থাকে। তাই এই সময় অতিরিক্ত তেল ও মশলাজাতীয় খাবার না খাওয়া উচিত। আবার যে খাবারগুলো আমাদের দেহে উত্তেজক রূপে কাজ করে সেগুলি কম মাত্রায় খাওয়া উচিত। যেমন--- ডিম, মাংস, রসুন, গরমমশলা ইত্যাদি। অনেকের গরমকালে কোল্ড ড্রিংকস খাওয়ার অভ্যাস আছে। কিন্তু এই ধরনের পানীয়ের মধ্যে কিছু ক্ষতিকারক প্রভাব আছে। এতে নানা ধরনের রাসায়নিক পদার্থ থাকে। শর্করার পরিমাণ অতিরিক্ত থাকে। তাই এই ধরনের পানীয় এড়িয়ে চলা উচিত।

আপনার খাদ্য তালিকা আপনার শরীর সুস্থ রাখার চাবিকাঠি। তাই সঠিক খাদ্য নির্বাচন করুন এবং সুস্থ থাকুন। ■

ব্রতিনীর মনের সাধ না মেটা অবধি চলতে থাকে ব্রত

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

সুবচনী ব্রত :

'আমার মা'র বাপের বাড়ি' গ্রন্থে রানি চন্দ লিখেছেন নানান লোকায়ত ব্রত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় সমকালীন গ্রামীণ পরিবেশ, পারিবারিক সম্পর্ক এক লহমায় উঠে আসে। গ্রামের উন্মুক্ত বিলের ঘাটলার উপর পৈঠাতে রয়েছে লাল রঙের পুতুলের মতো শোয়ানো তিনটি তেল-সিঁদুরে পুরু হয়ে ওঠা 'সুবচনী'-র ত্রয়ী মূর্তি— আকলি, সুমতি, ভগবতী এই তিন বোন— একত্রে সুবচনী; ছোটো ছেলের মানুষ আঁকার মতো সে পুতুল, একটা গোলাকার মাথা, দুপাশে ঊর্ধ্ব বাহুর মতো দুই হাত, হাঁটু ভেঙে দাঁড়ানোর ভঙ্গি।

লোকবিশ্বাস, এরা গৃহস্থকে সুখবর এনে দেন— সংসারে স্বামী, সন্তানেরা বিদেশ-বিভুঁইয়ে থাকে; সংসারে অসুখবিসুখের জ্বালাযন্ত্রণা, প্রতিনিয়ত অঘটন-দুর্ঘটন আর তখন কাছের জনের সংবাদ না পেলে মা-মাসির বুক কাঁপে। কুশল খবর এনে দেবার জন্য মায়েরা সুবচনীকে ডাকেন আর কুশল সংবাদ পেলে সবচাইতে আগে স্মরণ করেন তাঁকে। ব্রতের সেই উপাদান খুবই সামান্য— পিতলের রেকাবিতে পান-সুপারি সিঁদুর, ছোটো বাটিতে সামান্য তেল সাজিয়ে গৃহকর্ত্রী আসেন ঘাটলায়; দেওয়া হয় উলুধ্বনি, সুসংবাদ পেয়ে গ্রামবাসী ছুটে আসেন, যোগ দেন সুবচনীর ব্রতকথায়। মানতকারিণী সুবচনীকে তেল-সিঁদুর মাখিয়ে, তিন বোনকে তিনটি গোটা সুপারি বাতাসা দিয়ে, ফুল-দুর্বা হাতে নিয়ে ঘিরে বসেন।

ব্রতকথা চলতে থাকে— এক জন্মদুঃখী অনাথ ছেলে 'দুইখ্যা'-র অতীব দুঃখে দিন কাটে, বনেবাদাড়ে ঘোরে, কচুঘেঁচু খায়। এদিকে সুবচনীর তিন বোন হিজলতলায় দাবা পাশা খেলেন। একদিন তিন বোনের দেখা পায় দুইখ্যা। দুইখ্যার কষ্ট দেখে তাদের দয়া হয়। সেই দয়ার সংবাদ জগতে ছড়িয়ে দিতে সুবচনীর ব্রত চালু হয়। এ ভাবেই যেন অকূলে পড়লে পাড়ে তোলেন

সুবচনী, বর দেন। ব্রত শেষ হলে পুনরায় উলুধ্বনি পড়ে। ব্রতকারিণী সকল নারীর মাথায় আশীর্বাদী তেল ছোঁয়ান, হাতে দেন পান-সুপারি, সধবাদের কপালে সিঁদুর পরানো হয়। ছোটোরা ব্রতকথা শুনে দুটো বাতাস পায়। সকলে মঙ্গলানন্দে গৃহে ফেরেন। একজনের সুখবরে পাঁচজন আনন্দিত হন, এ এক অন্তরঙ্গ গ্রামীণ সম্পর্ক ছিল সে সময়। বিবাহের অনুষ্ঠান, গাঁয়ের মেয়ে শ্বশুর বাড়ি যাবে, সবই জানানো হয় সুবচনীকে। সঙ্গে উলুধ্বনির শুভ-সংকেত।

লালুব্রত :

রানি চন্দ উল্লেখ করেছেন 'লালুব্রত'-র কথাও, এরই নাম 'লাউল্যার বর্ত'। এই ব্রতের উৎসাহী ও পৃষ্ঠপোষক তাঁর দিদিমা। ব্রতের জন্য ছোটো-ছোটো দুটি কাঠের পিঁড়ি গড়িয়ে দেন তাদের দুই বোনকে। পিঁড়ির উপর শীতের বিকেলে পুকুরপাড়ের নরম মাটি দিয়ে স্তূপ গড়া হয়, সেটাই লালু— না শিব না মন্দির। দুই বোনে বিকেলে রং-বেরঙের ফুল তোলে, যা সারারাত তাজা থাকবে, ভোরেরও সতেজ দেখাবে। প্রদীপের আলোয় বসে সন্ধ্যায় দুই বোন সেই ফুল দিয়ে লালু সাজায়, ফুলে ফুলে লালুর সর্বাঙ্গ ঢেকে যায়, একটুও গা দেখানোর জো নেই। হলুদ অতসীর বোঁটা লালুর গায়ে গাঁথা হয়, গাঁদা-টগর-কলকে ফুলে সজ্জিত হয় লালুর দেহ ও পিঁড়ি। সাজানো হয়ে গেলে খাটের নীচে ঠেলে দুই বোন ঘুমাতে যায়। পরদিন ভোরবেলা দিদিমা ডেকে তোলেন তাদের, গাঁয়ে গিঁট দিয়ে শীতের কাঁথা বেঁধে দেন, ঘুম-ভরা চোখ নিয়ে লালুর পিঁড়ি সঙ্গে করে কুয়াশা ঠেলে দুই বোন গাঁয়ের পথে চলে, দিদিমার হাতে ফুলের সাজি— শিশিরে ভেজা মাটিতে সকলের পা ভিজে যায়; ভোরের শুকতারা তখন জ্বলজ্বল করছে। পুকুরের ঘাটলায় জলের ধারে সিঁড়িতে লালু বসানো হয়; তখন জলের উপর ঘন কুয়াশার পরত, এই কুয়াশাই ব্রতচারিণী ভাঙবে, তবেই সূর্যদেব ঝিকিমিকি দিয়ে পুবের আকাশে উঠবেন— এটাই হলো লালু ব্রত। অন্য বাড়ির বালিকারাও একে একে আসে। এক একটি ছড়া সুর করে কেটে ফুল নিয়ে জলে ফেলা হয়— 'উঠো উঠো সূর্যিঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া,/না উঠিতে পারি মোরা শিশিরের লেইগা।' নীচ থেকে ধীরে ধীরে উঁচু গাছে কুয়াশা উঠে যায়, ভোর ছেড়ে সকাল হয় বিশ্ব।

এই যে কনকনে শীতের জড়িমা ছেড়ে উঠার প্রশিক্ষণ, এই যে সাজানোর নান্দনিকতা বাঙ্গলার মেয়েদের দেওয়া শুরু হতো সেই অল্প বয়সে তা যেন প্রকৃতির সঙ্গে খাপখাওয়ানোর এক ট্রেনিং, নন্দনতত্ত্বের শিক্ষা— যার নেতৃত্বে থাকতেন দিদিমা-ঠাকুমারা, ছাত্রী তৃতীয় প্রজন্ম। এমন করেই শীতের একমাস ধরে রোজ রোজ লালু গড়া হয়, ফুল তোলা হয়, লালু সাজানোর পালা চলে আর ভোরের আলো-আঁধারিতে ঘাটলার ধারে চলে নিত্য আচার-আচরণ। কার লালু কত সুন্দর, কত কেরামতির— সেও এক প্রতিযোগিতা— সুনিপুণ গৃহিণী হয়ে উঠার শিক্ষা! বাঙ্গলার নারী এভাবেই গড়ে উঠেছে বাল্যকাল থেকে।

ব্রত কাকে বলে?

কোনো কিছু কামনা ও চেষ্টা করে, আশা-আশঙ্কা করে প্রকৃতিকে অনুকরণের মাধ্যমে যে লৌকিক-সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন, তাকেই বলে ব্রত। এই কামনার প্রতিচ্ছবিতে আলপনা মূর্ত হয়ে ধরা দেয়, প্রকাশ পায় লোকায়ত পরত। পূজারি ও তন্ত্রমন্ত্র বর্জিত এ এক লোকায়ত অনুষ্ঠান, যার সঙ্গে পার্থক্য রয়েছে পূজানুষ্ঠানের। পূজা সুনির্দিষ্ট সময়ে হয় সকলের জন্যই তার অনুষ্ঠান, ব্রতটি অনুষ্ঠিত হয় কোনো কিছু কামনা করে, ব্রতিনীর জন্যই এই অনুষ্ঠান। যতক্ষণ না পর্যন্ত কামনার পরিসমাপ্তি হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ব্রত চলতে থাকে। কামনার শেষে ব্রতের উদ্‌যাপন হয়।

ব্রতের প্রকারভেদ :

অবনীন্দ্রনাথ উল্লেখ করছেন ব্রত দুই প্রকার : ১. শাস্ত্রীয় বা পৌরাণিক ব্রত এবং ২. মেয়েলি ব্রত। মেয়েলি ব্রত দ্বিবিধ— কুমারী ব্রত এবং নারী ব্রত (বিয়ের পর যা পালিত হয়)। পৌরাণিক ব্রতগুলি হিন্দু ধর্মের সঙ্গে ভারতবর্ষে প্রচারিত হয়েছে। মেয়েলি ব্রতগুলি পুরাণের পূর্বেকার বলে উল্লেখ করেছেন অবনীন্দ্রনাথ, যার মধ্যে প্রাক-হিন্দু ও হিন্দু ধর্মের একটা আদান-প্রদান চলেছিল বলে তিনি বিশ্বাস করেছেন।

শাস্ত্রীয় ব্রতে সামান্য কাণ্ড, ভুজ্যি-উৎসর্গ এবং ব্রাহ্মণ-দক্ষিণার পর ব্রতকথা-শ্রবণের আয়োজন করা হয়। ব্রত কেন পালন করা হবে, কীভাবে ব্রত পালনে রুচি আসবে— সে কারণেই ব্রতকথা শোনার আয়োজন। নারীব্রত হলো শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয়— এই দুই অনুষ্ঠানের সমন্বয় বা যুগলমূর্তি। এতে যেমন বৈদিক অনুষ্ঠানের গভীরতা বিলুপ্ত হয়েছে, পাশাপাশি লৌকিক সরলতা হারিয়ে উদয় হয়েছে পূজারি ব্রাহ্মণের অংশগ্রহণ; তাই ন্যাসমুদ্রা-তন্ত্র-মন্ত্রের প্রাধান্য ঘটেছে। বরং লৌকিক সরলতার খাঁটিভাব পরিলক্ষিত হয় কুমারী ব্রতের মধ্যে। এ যেন হিন্দুধর্মের সুলভ সংস্করণ কুমারীর মনোজগতে প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা! খাঁটি মেয়েলি ব্রতের ছড়ায় আর আলপনায় একটি জাতির মন, চিন্তা ও চেষ্টার ছাপ রয়ে যায়।

শাস্ত্রীয় ব্রতের ফারাক কতটা তা বুঝতে সূর্য উপাসনা মূলক ব্রতের সূর্য-আহ্বানকে বিশ্লেষণ করা যাক।

বৈদিক সূর্যস্তব এই রকম :

ঊষাদেবতা। অঙ্গিরাপুত্র কুৎস ঋষি।
সূর্যদেবতা। কণ্বপুত্র প্রস্কণ্ব ঋষি।

মেয়েলি ব্রতের সূর্যস্তব এইরকম :

'নমঃ নমঃ দিবাকর ভক্তির কারণ,
ভক্তিরূপ নাও প্রভু জগৎ-কারণ।
ভক্তিরূপে প্রণাম করিলে তুয়া পায়,
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি করেন প্রভু দেবরায়।।'

আবার খাঁটি মেয়েলি ব্রতের মন্ত্র এইরকম :

'উরু উরু দেখা যায় বড়ো বড়ো বাড়ি,
ওই যে দেখা যায় সূর্যের মার বাড়ি।
সূর্যের মা লো! কি কর দুয়ারে বসিয়া!
তোমার সুরয আসতেছেন ষোড় ঘোড়ায় চাপিয়া।'

স্বামী নির্মলানন্দ ব্রতগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন—

১. কিছু ব্রত নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও চরিত্র গঠনের সহায়ক; যেমন

কুমারী ও সধবা ব্রতের অনুষ্ঠান।

২. কিছু ব্রত শান্তিময় পারিবারিক জীবন গঠনের সহায়ক।

৩. কিছু ব্রত সামাজিক ও জাতীয় কল্যাণ সাধনের অভীপ্সাকে বাস্তবায়িত করার প্রেরণাদায়ক।

৪. কিছু ব্রত উদ্‌যাপন গভীর আশ্বাস ও অভয়ের সহায়ক।

৫. কিছু ব্রত প্রবৃত্তির উদ্দাম প্রবাহ থেকে প্রত্যাবৃত্তের এবং নিবৃত্তির সহায়ক।

নানান মাসের ব্রতানুষ্ঠান :

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে পালিত হয় বসুধারা ব্রত। উদ্দেশ্য বসুধা বা পৃথিবীকে উর্বরা এবং শস্য-সবুজ করে তোলা। ফসলের জন্য জল লাগে, জলের জন্য বৃষ্টি, বৃষ্টি কামনায় এই ব্রত।

বৈশাখ মাসের আর একটি ব্রত হলো দধিসংক্রান্তি। এটি সৌরজগৎ বিষয়ক একটি ব্রত। এছাড়া কলাছড়া ব্রত, ঘৃত সংক্রান্তি ব্রত, আদর সিংহাসন ব্রতও বৈশাখ মাসে অনুষ্ঠিত হয়।

অরণ্যষষ্ঠী/জামাইষষ্ঠী/বাঁটাষষ্ঠীর ব্রত উদ্‌যাপিত হয় জ্যৈষ্ঠ মাসে। সুসন্তান কামনায় এই ব্রত। আষাঢ় মাসে নাগপঞ্চমীর ব্রত অনুষ্ঠিত হয়, তাতে পূজিতা হন দেবী মনসা। সর্প পূজা এই ব্রতের অঙ্গ, ব্রত উদ্‌যাপন করলে সর্পভয় নিবারিত হয়। ভাদ্র মাসের একটি ব্রত হলো ভাদুলি। বিদেশ-বিভূয়ে পরিবারের বাবা-দাদা-ভাইরা নিরাপদে থাকুক, ফিরে আসুক সুস্থ শরীরে, সেজন্যই এই ব্রতের উদ্‌যাপন। আশ্বিন মাসে পালিত হয় কোজাগরী পূর্ণিমার ব্রত (ধনসম্পদ লাভের ব্রত)। অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন মাসে উদ্‌যাপিত হয় রালদুর্গার ব্রত (সুখ, সম্পদ, ঐশ্বর্য ও মনস্কামনা পূরণের ব্রত)। মাঘ মাসে কুলাই ব্রত (বাঘের উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্য), শীতলা ব্রত (বসন্ত রোগ নিবারণের জন্য ব্রত)। চৈত্র মাসের ব্রতানুষ্ঠানের মধ্যে মহাবিষুব সংক্রান্তির ব্রত, ঘেঁটু ব্রত (চর্মরোগ নিবারণের জন্য ব্রত) উল্লেখযোগ্য।

বসুধারা ব্রত :

ভারতের নারীরা পারিবারিক মঙ্গলের জন্য চৈত্র সংক্রান্তি থেকে টানা একমাস তুলসীমঞ্চে তুলসীধারার ব্যবস্থা করেন। একটি মাটির হাঁড়ির তলায় ছোটো একটি ফুটো করে, তাতে পলতের কাপড় প্রবেশ করিয়ে অতি ধীর ধারায় সেচের বন্দোবস্ত করেন তারা, একে বিন্দুপাতি সেচ বলা যেতে পারে। ইংরেজিতে Drip Irrigation। ভারতীয় নারী যে বসুধারা ব্রত পালনের অঙ্গ হিসেবে স্নান সেরে সেই ঝারায় জল ঢালেন এবং তুলসী পূজন করেন তাও তুলসী নামক এক পবিত্র ও ভেষজ উদ্ভিদের প্রতি ধন্যবাদাত্মক চিন্তন। বাঙ্গলার নারী আবৃত্তি করেন, 'তুলসী তুলসী নারায়ণ/তুমি তুলসী বৃন্দাবন/ তোমার শিরে ঢালি জল/অন্তকালে দিও স্থল।' জীবনকালে যেমন এ এক মহার্ঘ ভেষজ, অন্তিমকালেও তেমনি জীবনের মায়াজাল থেকে মুক্তির মহৌষধি; বাঙ্গলার ব্রতেও তারই পুণ্যপূজন। কবি অক্ষয় কুমার বড়াল 'এষা' কাব্যগ্রন্থে লিখছেন, 'তোমার নিঃশ্বাসে/সর্বরোগ নাশে/যায় দুঃখ পলাইয়া।' নানান ব্যাধিতে বনবাসী কৌম সমাজ তুলসীর ব্যবহার করে থাকে; কখনো এর ব্যবহার সর্দিকাশিতে, কখনো লিউকোডারমার চিকিৎসায়, কখনো দাঁতের ক্ষত দূর করার জন্য কখনো বা ম্যালেরিয়া ঘটিত জ্বরনাশক রূপে।

মাঘমণ্ডলের ব্রত :

সাবেক পূর্ববঙ্গে প্রচলিত এবং প্রতি মাঘ মাসে পালিত পাঁচ বৎসর ব্যাপী সূর্যোপাসনা মূলক একটি কুমারীব্রত হলো মাঘমণ্ডল। এই ব্রতের দুটি মূল কৃত্য হলো পঞ্চগুঁড়ির রঙিন আলপনা অঙ্কন এবং 'বারৈল' বা 'লাউল' নামক মৃত্তিকা-প্রতীক নির্মাণ, ফুল-দূর্বা দিয়ে তার সাজসজ্জা ও পূজন। মাঘমণ্ডল ব্রতে আঙিনায় অঙ্কিত হয় ব্রতমণ্ডল; তার উপরে গোলাকার সূর্য আর নীচে অর্ধচন্দ্র বা চন্দ্রকলা; মাঝে অয়ন-মণ্ডল। অয়ন-চিহ্নের সংখ্যায় বোঝা যায় ব্রতের পূর্ণতার বছর। আমার মা'র বাপের বাড়ি গ্রন্থে রানি চন্দ লিখছেন, 'এক বছরে এক গোলের আলপনা, দু' বছরে দু' গোলের। এক গোলের গায়ে আর একটি বৃত্ত দাগা...তিন বছরে তিনটি বৃত্ত, চার বছরে চারটি— আর পাঁচ বছরে পরপর রেখা টানা পাঁচটি বৃত্তের প্রকাণ্ড একটা আলপনা'।

মাঘ মণ্ডলের ব্রতে পিটুলি গোলার আলপনা দেওয়া হয় না, দিতে হয় চালের গুঁড়ির সঙ্গে হলুদ, সিঁদুর, ধানের পোড়ানো তুষ, শুকনো বেলপাতার গুঁড়ো মিশিয়ে নানা বর্ণে রঞ্জিত করে রঙিন আলপনা। রোজই দেওয়া হয় এই আলপনা, দু' আঙুলের টিপে গুঁড়ি নিয়ে আঙুল সামান্য নাড়িয়ে ঝুরঝুর করে ফেলে আঁকা হয় লতাপথ। পৌষের সংক্রান্তি থেকে মাঘের সংক্রান্তি পর্যন্ত চলে এই ব্রত।

'হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠান' গ্রন্থে চিন্তাহরণ চক্রবর্তী লিখছেন, 'প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া ব্রতিনীকে দূর্বাগুচ্ছের সাহায্যে চোখে ও মুখে জল ছিটাইতে হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম 'চউখে মুখে পানি দেওয়া'। সূর্য উঠিলে পাঁচালি গান করিয়া বারৈল' ভাসান হয়।...বারৈল দুইটিকে ফুল দূর্বা দিয়া সাজাইয়া একখানি ছোটো তক্তার উপর বসাইয়া পুষ্করিণীর জলে ভাসাইতে হয়। ইহার পর মণ্ডলের উপর ফুল দিতে হয়। পাঁচালিতে সূর্যের পূর্বরাগ ও বিবাহের কাহিনি বর্ণিত হইয়াছে।'

গ্রামের কিশোরীরা কাকভোরে মাথায়-ঘাড়ে কাঁথা জড়িয়ে ঘন কুয়াশা ঠেলে তাদের মা কিংবা দিদা-ঠাকুমার সঙ্গে দু'পাশের ঝোপ ছাড়িয়ে, শিশিরে ভেজা ঘাস মাড়িয়ে চলে ঘাটলায়। কে আগে ঘাটে যাবে যেন তার প্রতিযোগিতা চলে। জলের কাছে ঘাটে রাখা হয় বারৈল বা লাউল। তার সর্বাঙ্গ অতসী, টগর, কলকে, গাঁদা অথবা নানান বুনো ফুলে ঢাকা, কারণ তার গা দেখা গেলেই দোষ। আগের রাতে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল এই বারৈল।

'সূর্য উঠবেন, তাই তার পথ প্রশস্ত করতে কিশোরীরা সাজির ফুল জলে ছুঁড়ে সুর করে গায়, ''খুয়া ভাঙ্গি খুয়া ভাঙ্গি এ্যাচলার আগে, /সকল খুয়া গেল বড়ই গাছটির আগে।'' ধীরে ধীরে বড়ই বা কুল গাছের মাথা পরিষ্কৃত হয়ে কুয়াশা দূরীভূত হয়, সূর্য ওঠে, তার আলোকিত করুণায় পৃথিবী সচল হয়। 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' গ্রন্থে স্বামী নির্মলানন্দ লিখছেন, 'তিনি উদিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ধোপা, নাপিত, কামার, কুমোর, তাঁতি, সুরি, তিলি, মালী সকলকে জাগিয়ে তোলেন, সকলের গৃহই তিনি আলোকিত করেন, তখন প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্তব্যে ব্রতী হয়— সমগ্র জগৎ কর্মচঞ্চল হয়ে উঠে। ব্রাহ্মণ বধূ উপবীত, তন্তুবায় বধূ বস্ত্র, কর্মকার বধূ মাল্যাদি সরবরাহে ব্যস্ত হয়। ব্রতের ছড়ার ভিতরে এ দৃশ্যের এক চমৎকার বর্ণনা পরিস্ফুট। সামাজিক কর্তব্য ও দায়িত্ববোধের একটা পরিষ্কার

ছবি কুমারীদের অন্তরে স্বতঃ জাগ্রত হয়। ব্রতের ছড়ার মধ্যে এ রকম অনেক শিক্ষাই আছে।'

এই ব্রতের সবচাইতে আকর্ষণীয় বিষয়টি দেখানো হয়েছে চন্দ্রকলার সঙ্গে সূর্যের বিবাহানুষ্ঠানের প্রসঙ্গে। মাধবের কন্যা অপরূপ লাবণ্যবতী তন্বী-বালা চন্দ্রকলা। তাকে দেখে, তার রূপে সূর্য পাগল হয়ে বিয়ে করতে চান। ছড়ায় দেখতে পাই,

'চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা মেলিয়া ছিলেন কেশ।
তারে দেইখ্যা সূর্য ঠাকুর ফিরেন নানা দেশ।।
চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা মেলিয়া দিছেন শাড়ি।
তারে দেইখ্যা সূর্য ঠাকুর ফিরেন বাড়ি বাড়ি।।
চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা গোল খাড়ুয়া পায়।
তারে দেইখ্যা সূর্য ঠাকুর বিয়া করতে চায়।।'

সূর্যের মতো এক পাত্র পেলে মাধবের আপত্তি থাকার কথা নয়, তাই সুসম্পন্ন হয়ে গেল তাদের শুভবিবাহ। সূর্য পেলেন অজস্র দান সামগ্রী। কী নেই তাতে; আর হবেই-বা না কেন? মাধব যে লক্ষ্মীপতি! অতএব বিয়ের পর চন্দ্রকলা চললেন পতিগৃহে; আর এখানেই দেখানো হয়েছে বিচ্ছেদ আর মিলনের বেদনা-সুখের আনন্দঘন মুহূর্ত, পল্লী বাঙ্গলার চিরায়ত আবেগসঞ্চার। ব্রতিনীদের জীবনেও আসবে এই দিন; মা-বাবা-ভাই-বোন, প্রিয়জন, ক্রীড়াসহচরীদের ছেড়ে যেতে হবে স্বামীগৃহে। আবার মিলনসুখ অপেক্ষা করছে সেখানে, মিলনানন্দের আবেগ, লোকলাজ— সব মিলিয়ে এ এক দুঃখ-সুখের যুগলবন্দি!

মাঘমণ্ডল ব্রতের অনুপুঙ্খ ব্যাখ্যা করেছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিন-অঙ্কে বিভক্ত ব্রতের ছড়ার অসাধারণ বিবরণ দিয়েছেন তিনি। 'বাঙ্গলার ব্রত' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, 'এই মাঘমণ্ডল-ব্রতের প্রথম অংশে দেখা যাচ্ছে যে সূর্য যা, তাঁকে সেই-রূপেই মানুষে দেখছে এবং বিশ্বাস করছে যে, জলের ছিঁটায় কুয়াশা ভেঙে দিলে সূর্য-উদয়ের সাহায্য করা হবে। এখানে কামনা হলো সূর্যের অভ্যুদয়। ক্রিয়াটিও হলো কুয়াশা ভেঙে দেওয়া ও সূর্যকে আহ্বান। দ্বিতীয় অংশে চন্দ্রকলাকে দীর্ঘকেশ গোল-খাড়ুয়া-পায়ে একটি মেয়ে এবং সূর্যকে রাজা বর এবং সেই সঙ্গে সূর্যের মা ও চন্দ্রকলার বাপ কল্পনা করে মানুষের নিজের মনের মধ্যে শ্বশুরবাড়ির যে-সব ছবি আছে, সূর্যের রূপকের ছলে সেইগুলোকে মূর্তি দিয়ে দেখেছে। তৃতীয় অংশে সূর্য-পুত্র বা রায়ের পুত্র রাউল বা লাউল, এক-কথায় বসন্তদেব; টোপরের আকারে এঁর একটি মূর্তি মানুষে গড়েছে এবং সেটিকে ফুলে সাজিয়ে মাটির পুতুল হালামালার সঙ্গে বিয়ের খেলা খেলেছে। এখানে কল্পনার রাজ্য থেকে একেবারে বাস্তবের রাজ্যে বসন্তকে টেনে এনে, মাটির সঙ্গে এবং ঘরের নিত্যকাজের এবং খুঁটিনাটির মধ্যে ধরে রাখা হলো'।

লাউল বা লালুর বিয়ে করতে যাবার ছড়াটি খুব মনোরম।

'জলের মধ্যে ছিপছিপানী কিসের বাদ্য বাজে,
চান্দের বেটা লাউল্যা আজ বিয়া করতে সাজে।
সাজোরে সাজোরে লাউল্যা সোনার নূপুর দিয়া,
ঘরে আছে সুন্দরী কন্যা তুইল্যা দিমু বিয়া।'

লাউল বউ নিয়ে আসে; বিয়ের ভোজে সূর্য গামছা মাথায় দিয়ে অন্দরমহলে তদারকি করছেন। 'ঝিকুটি' খেলতে গিয়ে পাওয়া গিয়েছে কিছু টাকা, তা দিয়ে লাউলের বউকে শাঁখা কিনে দেওয়া গেল। রইল কিছু, তা দিয়ে ব্রতিনীর মায়ের শাঁখাও হলো, সব কুমারীরা নিজের মাকে শাঁখা পড়ান—

'লাউল্যার বউরে শাঁখা দিয়া বেশি হইল টাকা।
সেই টাকা দিয়া দিলাম মায়েরে শাঁখা।'

মাটির সঙ্গে সূর্যের ছেলে বসন্তদেব বা লাউলের বিয়ে আর মিলনের পালাও শেষ। ঋতুরাজ পৃথিবীকে ফুলে-ফলে ভরিয়ে বিদায় নিচ্ছেন। তাকে যেতেই হবে, একলাই, আবার শীতের মধ্যে বসন্ত হয়ে ফিরবেন, এখন বিদায়। কিন্তু মেয়েরা বৃথাই তাকে ধরে রাখার চেষ্টা করে—

'কৈ যাওরে লাউল গামছা মুড়ি দিয়া?
তোমার ঘরে ছেইলা হইছে বাজনা জানও গিয়া।
ধোপা জানাও গিয়া, নাপিত জানাও গিয়া, পুরুইত জানাও গিয়া।'

লাউলের ছেলের নাম রাখার অনুষ্ঠান—

'লাউলের ঘরে ছেইলা হইছে কি কি নাম-থুমু?
আম দিয়া হাতে রাম নাম থুমু।
বরই দিয়া হাতে বলাই নাম থুমু।
কমলা দিয়া কমল নাম থুমু।
জল দিয়া জল নাম থুমু।
রাজার বেটা রাজার ছেইলা রাজা নাম থুমু।'

কিন্তু লাউলকে যেতেই হবে। মধুমাস শেষ, বৈশাখের মেঘ দেখা দিল, মেঘ গর্জন করে উঠলো, ঝড় বইলো, উৎসবের সাজ-সরঞ্জাম লণ্ডভণ্ড করে ভেঙে পড়ল ফুলে-ভরা জইতের ডাল। ঋতুরাজকে বিদায় দিতেই হলো—

'আজ যাও লাউল,
কাল আইসো।
নিত্য নিত্য দেখা দিও।
বছর বছর দেখা দিও।'

অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে দেখা যায় মৎস্যজীবী মালো মেয়েরা নিষ্ঠা ভরে মাঘমণ্ডলের ব্রত করছে। মাঘ মাসের প্রতিদিন সকালে কুমারী মেয়েরা স্নান করে ভাঁটফুল আর দূর্বাদলে বাঁধা ঝুটার জলে সিঁড়ি পুজো করে উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র আওড়ায়। বিবাহের কামনাতেই এই ব্রত। ব্রতের শেষদিন তৈরি হয় রঙিন কাগজের চৌয়ারি, সেই চৌয়ারি মাথায় করে ভাসানো হয় তিতাসের জলে। অক্ষত চৌয়ারির দখল নিতে কিশোরেরা হুল্লোড় করে ওঠে। উঠোন জোড়া আলপনার মাঝে কিশোরী ছাতা মেলে বসে, তার মা ছাতার উপর ছড়িয়ে দেয় খই-নাড়ু, আর তা কাড়াকাড়ি করে খায় কিশোরেরা।

তথ্যসূত্র :

১. স্বামী নির্মলানন্দ (১৪১০ ষষ্ঠ সংস্করণ) বারো মাসে তেরো পার্বণ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ।

২. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাঙ্গলার ব্রত, ভূমিকা ও টীকা দিব্যজ্যোতি মজুমদার (২০১৪ প্রথম সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ) গাঙচিল, কলকাতা।

গোলপার্কে আইআইটি খড়্গপুর প্রকাশিত ক্যালেন্ডার বিষয়ে আলোচনা সভা

খড়্গপুর আইআইটি-র সেন্টার অব এক্সিলেন্স ফর ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম-এর পক্ষ থেকে ২০২২ সালের ক্যালেন্ডার প্রকাশ করা হয়েছে। ক্যালেন্ডারের নাম — রিকোভারি অব দ্য ফাউন্ডেশন অব ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম। ক্যালেন্ডারের ১২টি পাতায় সিন্ধুসভ্যতা, চক্রযুগ, স্থান-কাল, অরৈখিক প্রবাহ পরিবর্তন, প্রাচীন ঋষি, মহাজাগতিক আলো ও সময়ের যুগ, ধ্বনিবিদ্যা ও প্রেক্ষাপট,

অবনীন্দ্রনাথ ঠকুরের অঙ্কিত ভারতমাতা, স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দের চিত্র এবং বিষয়বস্তু সুনজর ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আর্য আক্রমণের মিথ্যাতত্ত্বর মতো বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। ক্যালেন্ডারটি দেশে বিদেশে প্রশংসিত হওয়া সত্ত্বেও খড়্গপুর আইআইটি-র মতো দেশের অগ্রগণ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংস্থা নবপ্রজন্মের কাছে সত্য বিষয়টি তুলে ধরতেই মিথ্যার কারবারিরা খেপে উঠেছেন। এমনকী তারা খড়্গপুর আইআইটি-র সামনে বিক্ষোভও দেখিয়েছেন।

ক্যালেন্ডারের বিষয়বস্তু শিক্ষিত মনুষদের সামনে তুলে ধরার উদ্দেশে তিনটি রাষ্ট্রবাদী সংগঠন— বিজ্ঞান ভারতী, জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘ এবং অ্যাসোসিয়েশন অব ওয়েস্ট বেঙ্গল গভঃ কলেজ টিচার্স গত ৩ এপ্রিল কলকাতায় গোলপার্করামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের শিবানন্দ সভা গৃহে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। আলোচনাসভার বিষয়বস্তু ছিল—‘ বর্তমান ভারতের সমস্যা ও সমাধান ঃ আইআইটি খড়্গপুর ক্যালেন্ডার সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ’। স্বামী সুপর্ণানন্দজী মহারাজ প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন। ড. ঋতা ভট্টাচার্য সরস্বতী বন্দনা করেন। মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন স্বামী সুপর্ণানন্দ মহারাজ, বিশেষ অতিথি খড়্গপুর আইআইটি-র ড. পল্লব ব্যানার্জি, জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘের রাজ্য সভাপতি অধ্যাপক বুদ্ধদেব সাউ , অধ্যাপক বিনয়ভূষণ চক্রবর্তী এবং প্রধান বক্তা খড়্গপুর আইআইটি-র সেন্টার অব এক্সিলেন্স ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমের চেয়ারম্যান তথা স্থপতি বিভাগের অধ্যাপক ড. জয় সেন। সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে আশীর্বাণী প্রদান করেন স্বামী সুপর্ণানন্দজী মহারাজ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন অ্যাসোসিয়েশন অব ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট কলেজ টিচার্স-এর আহ্বায়ক ও সম্পাদক অধ্যাপক নির্মল মাইতি। অধ্যাপক সেন পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে ক্যালেন্ডারের প্রতি পাতার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেন। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসুদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী দীর্ঘ সময় মুগ্ধ হয়ে তাঁর বক্তব্য শোনেন। সভা সঞ্চালনা করেন জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষণা সঙ্ঘের সহ-আহ্বায়ক ও মিডিয়া প্রকোষ্ঠ প্রমুখ অধ্যাপক বলরাম দে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অধ্যাপক অনুপম বেরা।

জলপাইগুড়িতে উত্তরবঙ্গ সীমান্ত চেতনা মঞ্চের প্রান্ত অধিবেশন

গত ২৬,২৭ মার্চ জলপাইগুড়ি শহরের পাণ্ডাপাড়া সারদা শিশুতীর্থে উত্তরবঙ্গ সীমান্ত চেতনা মঞ্চের রাজ্য অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে ৯০ জন প্রতিনিধি-সহ ১৫০ জন উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সীমা জাগরণ মঞ্চের অখিল ভারতীয় সংযোজক গোপাল কৃষ্ণজী, সহ সংযোজক প্রদীপনজী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত, জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায় এবং সীমান্ত চেতনা মঞ্চের উত্তরবঙ্গের সংগঠন সম্পাদক গণেশ চন্দ্র পাল এবং সভাপতি প্রদীপ চন্দ। গোপাল কৃষ্ণজী বলেন, সীমা জাগরণ মঞ্চ ভারতের আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকায় বসবাসরত লোকেদের মধ্যে দেশভক্তি জাগরণের কাজ করে চলেছে।। শ্রীদত্ত বলেন, দেশের সীমান্ত সুরক্ষা হলে দেশ সুরক্ষিত থাকবে। উত্তরবঙ্গে নানাভাবে সীমান্ত পেরিয়ে অনুপ্রবেশ চলছে। গোপাচার, চোরাচালান চলছে। সীমান্ত চেতনা মঞ্চের কাজ বৃদ্ধির ফলে আজ অনেকটা সীমান্ত সুরক্ষিত হয়েছে।

সাংসদ জয়ন্ত রায় বলেন, উত্তরবঙ্গে বাংলাদেশ সীমান্ত বিষয়ে সংসদে আলোচনা হয়েছে। আগামীদিনে সীমান্ত চেতনা মঞ্চের সঙ্গে একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার করেন তিনি। সবশেষে, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মাধব চন্দ্র বর্মন সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

ফঃ ৫

পশ্চিমবঙ্গে ৩৫৬ ধারার প্রয়োগ একান্তই প্রয়োজনীয়

রামানুজ গোস্বামী

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটি বর্তমানে ভয়াবহ নির্মমতা, নৃশংস হত্যাকাণ্ড, বিরোধী নেতা-নেত্রীদের উপরে যেমন খুশি আক্রমণ এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ইত্যাদি নানা কারণে সারা ভারত তথা সমগ্র বিশ্বের কাছে বহুল পরিমাণে সমালোচিত ও ধিক্কৃত হয়েছে। এই রাজ্যের অধিবাসীদের কাছে ব্যাপারটা যে নিতান্তই লজ্জার, তা আর নতুন করে বলবার অপেক্ষা রাখে না, অবশ্য কেউ তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক হলে তাদের কথা আলাদা। এই সমর্থকেরা নানাভাবে এটাই প্রমাণ করতে চায় যে, এই রাজ্য ভারতে সব রাজ্যের থেকে এগিয়ে। তাই যে কোনো ঘটনাকেই তুচ্ছ ঘটনা, সাজানো বা ছোট্ট ঘটনা অভিহিত করবার পুরানো প্রয়াস এখনো অব্যাহত। এক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ বলা যেতেই পারে যে, সাম্প্রতিককালে এই বগটুই কাণ্ডের পরে ঘটনাপ্রবাহকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য টিভি থেকে আগুন লেগেছে, এমন কথা বলা হয়েছিল। এর আগেও বহু ক্ষেত্রে এমন বিভ্রান্তিকর প্রচার চালানো হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে তো তা তৃণমূলের একেবারে সর্বোচ্চ স্তর থেকেই করা হয়েছে। খাগড়াগড় কাণ্ডের কথা এক্ষেত্রে বলা যেতেই পারে। সেক্ষেত্রে প্রেসার কুকার তত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে অবশ্য জানা যায় যে, এই ঘটনায় জঙ্গিযোগ রয়েছে। সে যাই হোক, বগটুইয়ের গণহত্যা যে মানবতার কলঙ্ক, এতে কোনো সন্দেহই নেই। এতে কোন্ কোন্ গোষ্ঠী জড়িত বা আদৌ এটা নিছকই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নাকি আরও বড়ো কোনো ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত, এই সবই তদন্তসাপেক্ষ এবং সিবিআই এই ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেছে। প্রশ্ন হলো, রাজ্যের প্রশাসনের ভূমিকা এক্ষেত্রে কী ও কতখানি?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে বেশি কিছু বলার দরকারই নেই। তার কারণ, রাজ্য-পুলিশ (এবং কলকাতা পুলিশ) প্রশাসন বর্তমানে একেবারে কাণ্ডজ্ঞানহীন অপদার্থে পরিণত হয়েছে। এটা যে একমাত্র বিরোধীপক্ষই বলছে, তা কিন্তু নয়,

প্রাক্তন পদস্থ পুলিশকর্তাদের অভিমতও এটাই। আসলে সাম্রাজ্যবাদী, জমিদারি ধরনে গণতান্ত্রিক শাসন পরিচালনা কারার ফল যা দাঁড়ায়, এক্ষেত্রে ঠিক সেটাই হয়েছে। Absolute Dictatorship ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে এই মুহূর্তে কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই। তাই, যখন খুশি বিরোধী দলের কর্মীদের হত্যা করা যায়, একঘরে রাখা যায়, মহিলাদের লাঞ্ছনার কোনো রকম সীমা-পরিসীমা থাকে না, নির্বিচারে চলে অত্যাচারীর অপশাসন, নিঃসন্দেহে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান চিত্র ঠিক এটাই। তাই এই রাজ্যের কোথাও কোনো ভোট নিরুপদ্রবে বা শান্তিপূর্ণভাবে হয় না--- অবধারিত ভাবেই ঘটে থাকে হিংসা, হানাহানি। এই সকল ক্ষেত্রগুলি বিবেচনা করলে, অবশ্যই সারা দেশে সবার আগে উঠে আসবে পশ্চিমবঙ্গেরই নাম।

NHRC-র রিপোর্টে তো এই সকল কথাই উঠে এসেছে। স্পষ্টত, এই রাজ্যে আইনের শাসন চলে না, বরং চলে শাসকের আইন। ঠিক এই কারণেই দেশের আইন-কানুন এই রাজ্যে প্রণয়ন করতে চাইলে, কেন্দ্রীয় সরকারকে বহুবিধ বাধার সম্মুখীন হতে হয়, ঠিক এই কারণেই সীমান্ত সুরক্ষার প্রশ্নে সরাসরি ভাবেই কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে বিরোধ ঘটে (যার জন্য রাজ্য-সরকারের ভয়াবহ মুসলিম-তোষণ নীতিই দায়ী) এবং ঠিক এই কারণেই প্রতিনিয়ত এই রাজ্যে ভারতীয় সংবিধানের মর্যাদা লুণ্ঠিত হয়।

এটা তো একেবারেই সত্য যে, যেন-তেন প্রকারেণ ক্ষমতায় টিকে থাকবার জন্য আজ তৃণমূল কংগ্রেস একেবারে উঠে পড়ে লেগেছে। সমাজবিরোধী ও দুষ্কৃতীদের নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা প্রদান, পুলিশ-প্রশাসনকে একেবারেই দলদাসে পরিণত করা, সীমাহীন মুসলমান-তোষণ (যা ভারত ও ভারতীয়দের সামগ্রিক নিরাপত্তার জন্য অতীব বিপজ্জনক), সমাজের সর্বত্র অপরিসীম দুর্বৃত্তায়ন ও অপসংস্কৃতি ছড়িয়ে দেওয়া এবং সমস্ত ক্ষেত্রেই বিপুল দুর্নীতি--- এটাই হলো পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক চিত্র। তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই এখন পশ্চিমবঙ্গের আনাচে-কানাচে অস্ত্র পাওয়া যায়, মেলে অস্ত্র কারখানার হদিশ; সর্বোপরি পশ্চিমবঙ্গ ইসলামিক জঙ্গিদের সর্বাপেক্ষা নিরাপদ আশ্রয়স্থল। এখান থেকে একের পর এক জঙ্গি ধরা পড়ে। এই হলো তৃণমূলি শাসনের নমুনা।

তাই, মানুষের জীবন সুরক্ষিত রাখতে, গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোকে বাঁচাতে অবিলম্বে এই রাজ্যে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ বা রাষ্ট্রপতি শাসন কায়েম করা দরকার। তবেই বাঁচবে মানুষ, বাঁচবে পশ্চিমবঙ্গ, বাঁচবে সারা ভারত। রাজ্যের সরকার যদি রাজ্যের মানুষের জীবনের সুরক্ষা না দিতে পারে, স্বাভাবিক গঠনমূলক সমালোচনা গ্রাহ্য না করে বিরোধীদের উপরে উপর্যুপরি আক্রমণ চালাতে থাকে, দেশের আইন-কানুনের তোয়াক্কা না করে সংবিধানকে অবমাননা করতে থাকে, তবে রাষ্ট্রপতি শাসনই একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত। তাই আর সময় নষ্ট না করে অবিলম্বে ভারত সরকারের উচিত এই ব্যাপারে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা। অন্যথায় আগামীদিনে জাতীয় ক্ষেত্রে ঘটে যাবে ভয়াবহ বিপর্যয়। এই বিপর্যয় দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তাকে আঘাত হানতে পারে। তাই এ ঘটনা যাতে না ঘটে, তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং পশ্চিমবঙ্গে তার প্রয়োগ করাই হলো একমাত্র পথ। □

শিখধর্মের আশ্রয় নিলেন তেলেঙ্গানা জনজাতির মানুষরা

কৌশিক রায়

তেলেঙ্গানা রাজ্যের অন্তর্গত 'হায়দরাবাদ-বেঙ্গালুরু মহাসড়ক থেকে কিছুটা দূরে শামসাবাদ জেলাতে অবস্থিত একটি শান্তিময় ছোটোগ্রাম— 'গাচুবই থান্ডা'। ভক্তিবাদের অন্যতম প্রবক্তা-রামানুজাচার্যের একটি ২১৬ ফিট লম্বা মূর্তি এই গ্রামেই নরেন্দ্র মোদী সম্প্রতি উদ্বোধন করেছেন। তবে, এই গাচুবাই থান্ডা গ্রামটি একটি বিশেষ কারণে সংবাদ শিরোনামে জায়গা করে নিয়েছে। এই গ্রামের জনজাতি মানুষেরা সকলেই স্বেচ্ছায় শিখধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন। এর ফলে গ্রামটির নাম পরিবর্তিত হয়েছে 'গুরুগোবিন্দ সিংহ নগরে'।

বর্তমানে গাচুবাই থান্ডা গ্রামের উপজাতি কিশোর ও তরুণরা পঞ্জাবে প্রচলিত বিভিন্ন কায়দাতে পাগড়ি পরা শিখছে। এগুলি হলো 'শাহি পাগ', 'গোল পরনা' ও 'পটকা'। খালসাপন্থী শিখদের মতো হাতে তরবারি বা কৃপাণও রাখছেন এখানকার জনজাতির মানুষরা। গ্রামটিতে বর্তমানে ৬০০ জন বাসিন্দা আছেন। এদের সকলেই শিখ ধর্ম গ্রহণ করেছেন। এঁরা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে গ্রামটিতে শিখ গুরুদ্বারা তৈরিও করেছেন। গত ২০ বছর ধরেই এই জনজাতির মানুষরা শিখ ধর্মে দীক্ষিত হয়ে চলেছেন। এঁরা মূলত তেলুগু, হিন্দি ভাষা ও লাম্বাডি নামক একটি উপভাষায় কথা বলে থাকেন। তবে এই গ্রামবাসীরা কিন্তু শিখধর্ম গ্রহণ করলেও পঞ্জাবি ভাষাতে কথা বলতে অভ্যস্ত নন। এই গ্রামবাসীরা প্রত্যেকেই নিজের নাম পালটে শিখ নাম গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে এই গ্রামের গুরুদ্বারা সাহিব দশমেশ দরবারের

৭৩ বছর বয়স্ক সভাপতি লখবিন্দার সিংহের আসল নাম ছিল খেতাওয়াত দিপলা। গাছুবাই থান্ডা গ্রামে সর্বপ্রথমে দীক্ষিত হওয়া শিখদের মধ্যে অন্যতম লখবিন্দার। তাঁর মতে— শিখধর্ম গ্রহণের পর উন্নাসিক, সমাজের উঁচুতলার মানুষের অপমান, ঘৃণা আর হিংসা থেকে অনেকটাই রেহাই পেয়েছে গ্রামবাসীরা।

আজ থেকে ৫০ বছর আগে এই গ্রামটির মানুষরা শিখ ধর্মের দিকে ঝুঁকতে শুরু করেন। তাঁরা ওই সময়ে মহারাষ্ট্রের নান্দেদ সাহিব গুরুদ্বারাতে উপাসনা করতে যেতেন। একটি উৎসর্গীকৃত ষাঁড়ের মরদেহের ওপর এই গ্রামে একটি মন্দিরও বানিয়েছেন সর্বধর্মসম্বন্বয়ে বিশ্বাসী শিখরা। গ্রামটির এক প্রবীণ মানুষ— ভগৎ সিংহের উদ্যোগে এখানে গুরুদ্বারা তৈরি হয়। হায়দরাবাদ ও পাকিস্তানের কয়েকটি গুরুদ্বারাতে কয়েকবার গিয়েছিলেন ভগৎ সিংহ। তারপরেই গোটা গ্রামের মানুষদের তিনি শিখধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পরামর্শ দেন। প্রথমদিকে ৭০ জন গ্রামবাসী শিখধর্মে দীক্ষিত হন।

প্রতিদিন ভোর ৪টের সময় প্রার্থনা এবং গুরু গ্রন্থসাহিবের স্তোত্রপাঠের মাধ্যমে গুরুগোবিন্দ সিংহ গ্রামের কাজকর্ম শুরু হয়। এখানে এলেই শুনতে পাওয়া যাবে খালসা শিখদের পবিত্র ধ্বনি— 'সৎ শ্রী অকাল/যো বোলে সো নিহাল/ওঁ সদ্‌গুরু কি খালসা/গুরুজী কি ফতেহ্।'

অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরের মতোই এখানেও বিনাব্যয়ে রান্না করা খাবার, রোজ দান করার জন্য 'গুরু কি লঙ্গরখানা' স্থাপিত হয়েছে। ২৬ জানুয়ারি গুরুগোবিন্দ সিংহের জন্মতিথি আর গণতন্ত্র দিবস এই গ্রামে একসঙ্গে পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে কীর্তন ও দানযজ্ঞও অনুষ্ঠিত হয়।

এই গ্রামের গুরুদ্বারাটির নির্মাণের জন্য অনেকেই অকৃপণ হস্তে দান করেছেন। পাটনা সাহিব থেকে বিশেষজ্ঞরা এসে গুরুদ্বারাটির নির্মাণকার্যের দেখাশোনা করেছেন। এই গুরুদ্বারার প্রথম পুরোহিত বা গ্রন্থী মোহন সিংহ, হায়দরাবাদের একটি গুরুদ্বারাতে ১৩ বছর ধরে ধর্মীয় প্রশিক্ষণও নিয়েছেন। শিখদের আত্মরক্ষামূলক মার্শাল আর্ট গাটকার প্রশিক্ষণ নিয়মিত কিশোর- কিশোরীদের দেওয়া হচ্ছে গুরুগোবিন্দ হিংস গ্রামে। ধূমপান, মদ্যপান, ব্যভিচার থেকে সম্পূর্ণভাবেই দূরে রয়েছেন এখানকার গ্রামবাসীরা। ▯

পঙ্কজকুমার মল্লিক
এক বহুমুখী সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব

রূপশ্রী দত্ত

পঙ্কজ মল্লিক ছিলেন ভারতীয় বাঙ্গালি কণ্ঠশিল্পী, সংগীত পরিচালক ও অভিনেতা। তিনি জন্মেছিলেন ১৯০৫ সালের ১০ মে। মৃত্যু ১৯৭৮ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। তাঁর বাবার নাম মণিমোহন মল্লিক ও মাতা মনোমোহিনী দেবী।

প্রথমে তিনি দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে গানের তালিম নেন। স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলে পড়াশোনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র দীপেন্দ্রনাথের পুত্র দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে পঙ্কজের যোগাযোগ হয়। তিনি কবিরও স্নেহের পাত্র হন। রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে তিনি এসময় থেকেই অগ্রণী শিল্পীর খ্যাতি অর্জন করেন।

১৯২৬ সালে, মাত্র একুশ বছর বয়সে রেকর্ড করেন— 'নেমেছে আজ দ্বারে প্রথম বাদল।' ১৯৩২ সালে প্রথম রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড করেন— 'প্রলয়নাচন না চলে যখন' এবং 'তোমার আসন শূন্য আজি'। রবীন্দ্রনাথের 'শেষ খেয়া' কবিতাটিতে পঙ্কজ সুরারোপ করেছিলেন। ১৯২৭ সালে কলকাতায়, ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনে কাজ শুরু করেন। এই সংস্থা পরে 'অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো' ও তাঁর পরবর্তীকালে 'আকাশবাণী কলকাতা' নামে পরিচিত হয়। প্রায় পঞ্চাশবছর তিনি আকাশবাণী'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ওই সর্বাধুনিক নাম 'আকাশবাণী' রবীন্দ্রনাথের দেওয়া। ইথারের শব্দতরঙ্গের কারণেই এই যথোপযুক্ত 'আকাশবাণী' নাম। আকাশবাণী কলকাতায় রবিবার সকালে 'সংগীত শিক্ষার আসর' পঙ্কজ কুমারের একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি। শিক্ষকের ভূমিকায় থেকে একদল শিক্ষার্থীকে আকাশবাণীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংগীতশিক্ষা দেওয়া এক অতি উপভোগ্য কাজ। বহু মানুষ সেসময় বাড়িতে বসে রেডিয়ো খুলে সানন্দে, সহজে নেপথ্যে থাকা পঙ্কজ মল্লিকের কাছ থেকে সংগীত-শিক্ষার পাঠ নিতেন। শিক্ষক হিসেবেও তিনি ছিলেন অসাধারণ। যথার্থ সুরটি বারবার গেয়ে অনুধাবন করাবার চেষ্টা করতেন।

১৯৩১ সাল থেকে দীর্ঘ ৩৮ বছর তিনি বাংলা, হিন্দি, উর্দু, তামিল সংগীতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি কুন্দনলাল সায়গল, শচীন দেববর্মণ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, গীতাদত্ত, আশা ভোঁশলে প্রমুখ সংগীত পরিচালক ও শিল্পীর সঙ্গে কাজ করেন। চলচ্চিত্রে তিনি কুন্দনলাল সায়গল, প্রমথেশ বড়ুয়া ও কানন দেবীর সঙ্গে অভিনয়ও করেছিলেন। নীতীন বসু ও রাইচাঁদ বড়ালের সঙ্গে তিনি ভারতীয় চলচ্চিত্রে নেপথ্য কণ্ঠসংগীতের প্রবর্তন করেছিলেন। ভারতের প্রথম যুগের ফিল্ম স্টুডিয়ো— নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গে তিনি ২৫ বছর যুক্ত ছিলেন। ১৯৩১ সালে, অল ইন্ডিয়া রেডিয়োতে মহালয়ার দিনে 'মহিষাসুরমর্দিনী' গীতিনাট্যে সুরসংযোজন করেছিলেন। পঙ্কজের পরিচালনায় সুরে, গায়কীতে ও কথায় এমন এক সম্মোহন ছিল, তখন ঘরে ঘরে শেষরাত্রি থেকে নিদ্রাভঙ্গ ও জাগরণ ছিল, গৃহবাসীদের মহালয়ার এক নিয়মিত ব্যাপার। পঙ্কজ 'পদ্মশ্রী' ও 'দাদাসাহেব ফাল্‌কে' পুরস্কার পান। এছাড়া অন্যান্য সম্মাননা :

১। পঙ্কজ মল্লিকের জন্মশতবর্ষে ভারতীয় ডাকবিভাগ স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করেন।

২। দূরদর্শনে একই বছরে জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ সংগীতানুষ্ঠান প্রচারিত হয়।

৩। ২০০৫ সালে পঙ্কজের গৃহে 'পঙ্কজ মল্লিক সংগীত ও আর্ট ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৫০ 'চিত্রাঙ্গদা', ১৯৫৫ 'রাইকমল', ১৯৬২ 'মহাপ্রস্থানের পথে'। ১৯৪৭ 'রামের সুমতি', ১৯৪০ 'ডাক্তার'— এইসব চলচ্চিত্রে তিনি একাধারে অভিনেতা ও গায়ক।

চল্লিশের দশকে পঙ্কজের গাওয়া 'চৈত্র দিনের ঝরাপাতার পথে, দিনগুলি মোর কোথায় গেল' এই গান শুনলে এই প্রজন্মের শ্রোতার চোখেও জল আসে। □

এখন তারাই দূরদূরান্তের গ্রামে সচেতনতা শিবিরে অংশ নেন। ঝাড়ফুঁক তুকতাকের অন্ধবিশ্বাসের ভিতটাকেই নড়িয়ে দিয়েছেন আশাদিদি মাতিলদা কুল্লু। এখন গর্গাদবহলের মতো গ্রামগুলির একটাই ভরসার মুখ তাদের আশাদিদি। একদিন যাকে বর্ণবাদের গঞ্জনাও মুখ বুজে সইতে হয়েছিল। করোনার প্রকোপের সময় শুধুমাত্র বড়গাঁও তহসিলেরই ৯৬৪ জন রোগীর চিকিৎসা করেছেন মাতিলদা। সেই সঙ্গে অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়েছেন। তার নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস গ্রামের মানুষদের স্বাস্থ্য-সচেতন করে তুলেছে। এখন সামান্য জ্বর-কাশি হলেও আশাদিদি মাতিলদার কাছে ছোটেন গ্রামবাসীরা।

গর্গাদবহলের আশাদিদিকে আন্তর্জাতিক সম্মান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ২০২১-এর শেষে যখন আন্তর্জাতিক ফোর্বস ম্যাগাজিন ভারতের ২১ জন প্রভাবশালী মহিলার তালিকা প্রকাশ করলো, সেখানে সবচেয়ে তাক লাগানো নামটি ছিল ওড়িশার মাতিলদা কুল্লুর। মাতিলদা ওড়িশার সুন্দরগড় জেলার একজন সামান্য আশাকর্মী। কিন্তু মানবিক আবেদনে সাড়া দিয়ে গ্রামের মানুষদের প্রথার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে অসামান্য হয়ে উঠেছেন সুন্দরগড়ের আশাদিদি।

সুন্দরগড় জেলার বরাগাঁ তহশিলের গর্গাদবহল একটি প্রত্যন্ত এলাকা। যেখানে অসুস্থ হলে ওঝা ডেকে ঝাড়ফুঁক করাই ছিল রেওয়াজ। নানারকম তুকতাক, টোটকার মতো অন্ধবিশ্বাসেই ডুবে ছিল সেখানকার গ্রামবাসীরা। ফলে ছোঁয়াচে রোগের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়তো নিমিষে। মহামারীতে উজাড় হতো আশেপাশের গ্রামগুলিও।

১৬ বছর আগে যখন মাতিলদা কুল্লু সচেতনতা প্রচারের জন্য গর্গাদবহল গ্রামে যান গ্রামবাসীদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয় তাঁকে। গ্রামের সবাই তাঁকে এবং তাঁর চিকিৎসা সচেতনতা নিয়ে উপহাস করেছিল। তাতে এতটুকুও দমে যাননি মাতিলদা। বরং তাঁর জেদ আরও বেড়ে গিয়েছিল।

তিনি বলেন, 'এই গ্রামের মানুষ অসুস্থ হলে ভাবতেই পারতেন না যে তাদের হাসপাতালে যেতে হবে। আমি যখন তাঁদের হাসপাতালে যাওয়ার পরামর্শ দিতাম, ওরা আমায় নিয়ে উপহাস করতেন। বর্ণবাদের জ্বালাও সইতে হয়েছে আমায়।'

এমনিতে আর পাঁচজন আশাকর্মীর মতোই কাজের প্রবল চাপ থাকে মাতিলদার। তার দিন শুরু হয় ভোর পাঁচটায়। পরিবারের জন্য খাবার তৈরি করেন। গবাদি পশুদের খাইয়ে দেন। তারপর সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। বাড়ি বাড়ি ঘোরেন। এর মধ্যে শুরু হলো করোনা ভাইরাসের দাপট। মাতিলদার নিত্যদিনের রুটিনে আরও চাপ বাড়লো। ওই সময় করোনার উপসর্গ থাকা প্রায় ৫০-৬০ জনের বাড়িতে রোজ ভিজিট করতে হতো মাতিলদাকে। তাঁর কথায়, 'প্রতিদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে করোনার উপসর্গ থাকা ব্যক্তিদের খোঁজ করতাম। তারপর স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রিপোর্ট করতে হতো। এভাবেই আমরা গ্রামগুলিকে অতিমারীর হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছি।'

আজ সুন্দরগড়ের গর্গাদবহল গ্রামের খোলনলচে বদলে গেছে। বদলে দিয়েছে মাতিলদার নাছোড় উদ্যম। যে গ্রামের লোকেরা ওঝাকেই ভগবান মনে করতেন, ফোর্বস ম্যাগাজিনের ২০২১ সালের প্রভাবশালী মহিলাদের তালিকায় তারাই ঠাঁই পেয়েছিলেন, যাঁরা সমাজের সমস্ত প্রতিকূলতা জয় করে লক্ষ্যমাত্রা স্পর্শ করেছেন এবং নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সমাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ২১ জনের তালিকায় ছিল স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার প্রাক্তন চেয়ারপার্সন অরুন্ধতী ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে অভিনেত্রী রেশমি দুগ্গালের মতো নাম। সেখানে তৃতীয় স্থানটি অর্জন করেন মাতিলদা। কম কথা নয়। ওড়িশার প্রত্যন্ত গ্রামের মেয়ে পঁয়তাল্লিশ বছরের মাতিলদা কুল্লু।

জনজাতি পরিবার থেকে তাঁর উঠে আসা রূপকথার গল্পের মতোই। বর্ণবৈষম্যের তাচ্ছিল্য ও গঞ্জনাও ছিল নিত্য সঙ্গী। সব কিছুই উপেক্ষা করে নিজের সামাজিক কর্তব্যে অবিচল থেকেছেন। তিনি বলেন, 'সমাজের জন্য সার্থকভাবে কিছু করার মধ্যে যে আনন্দ আছে তা অন্য কোথাও নেই। বর্ণবৈষম্য, প্রথা ও অন্ধবিশ্বাসের মতো ঘটনা তখনই ঘটে যখন এসব বিষয়ে মানুষের কোনো ধারণা থাকে না। মানুষকে বেশি করে সচেতন করতে হবে। সেটুকু কাজই আমি করেছি। ফোর্বসের সম্মান আরও বেশি আমায় উৎসাহিত করলো।' □

দুষ্টু পুষি

বল্টুদের পাড়ায় শীতকাল এলেই অনেক পরিযায়ী পাখি আসে। কিন্তু সেইসব সুন্দর পাখিরা খুব ভয়ে ভয়ে থাকে। কেননা একটা পুষি সবসময় ওদের ধরার জন্য ওত পেতে থাকে। বেড়ালটি এর বাড়ির বাগানে, ওর বাড়ির বাগানে সারাদিন ঘুরে বেড়ায় পাখি ধরার জন্য। পুষি আসার অগেই পাখিরা তা বুঝতে পারে। সবার আগে বুঝতে পারে টুনটুনি। সে অন্যদের সজাগ করে দেয়। বেচারা পুষিকে বার বারই খালি হাতে ফিরতে হয়। তাই টুনটুনির ওপর পুষির খুব রাগ।

পুষির থাবা খুব নরম আর তুলতুলে। নরম ঘাসের ওপর দিয়ে যখন যায় তখন আদৌ কারও বোঝার উপায় থাকে না যে পুষি আসছে। কিন্তু টুনটুনি ঠিক বুঝতে পারে যে পুষি আসছে। সঙ্গে সঙ্গে সকলকে সে সাবধান করে দেয়। পুষি তার এই দুঃখের কথা কাকে বলবে তা বুঝতেই পারে না। একদিন বল্টুদের পাঁচিলের উপর দিয়ে যেতে যেতে অন্যদিকের বাড়ির কার্নিশে সে একটা হুলোকে দেখতে পেল। তার মনে হলো এই তো সুযোগ। দল ভারী করলে টুনটুনি সহ সব পাখিতে শায়েস্তা করা যাবে। এই ভেবে সে বলল, ও ভাই হুলো শুনছ, তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে। হুলো প্রথমটায় বুঝতে পারেনি। এদিক ওদিক দেখে তারপর পুষিকে দেখতে পেয়ে মনে মনে ভাবল, আরে, সেই হ্যাংলা বেড়ালটা না! খালি পাখিদের ঠোক্কর খেয়ে বেড়ায়। তারপর মুখে হাসি এনে বলল, আরে বলো পুষি, কেমন আছ? বহুদিন বাদে দেখা হলো। — ভালোই আছি। তোমার সঙ্গে একটু পরামর্শ করার ছিল, বলল পুষি। — বলো কী পরামর্শ? — আরে ওই পাখির বাচ্চাগুলো এমন সেয়ানা হয়েছে যে ধরাই যায় না। খালি উড়ে উড়ে পালায়। — ও এই কথা। তা তোমার এই সমস্যা তো বহুদিনের। একটা কথা তোমার মাথায় ঢোকে না কেন পুষি, ওদের পাখা আছে ওরা উড়ে যাবে। ওদের ধরা অত সহজ নয়। আর

বাপু, তোমার কি বাড়িতে খাবার জোটে না? এবার যাও, এসব নিয়ে আলোচনা করতে ভালো লাগে না।

পুষি মুখ ব্যাজার করে ঘরে ফিরে গেল। কিন্তু সে হার মানবে না। ওই পুচকে পাখিগুলোর এত শয়তানি সে সহ্য করবে না। আর বুড়ো হুলো নিজেই নড়তে পারে না, শিকার ধরা তো দূরের কথা। তাই এসব বড়ো বড়ো কথা বলছে। ওর কথায় কান দিলে হবে না। পুষি দেখল বল্টু এখন পড়াশোনা করছে। পুষির মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। বল্টু বিছানায় ওর মামার দেওয়া একটা টুপি আছে। টুপিখানা খুব সুন্দর। তাতে অনেকগুলো ময়ূরের পালক লাগানো আছে। পুষি ভাবলো এই পালকগুলো যদি আমি গায়ে জড়িয়ে বসে থাকি তাহলে পাখিরা বুঝতে পারবে না। যেই ভাবা সেই কাজ। পরেরদিন বাগানে ময়ূরের পাখা গায়ে লাগিয়ে পুষি বাগানে গিয়ে ঘাপটি মেরে বসে রইল। তার পণ আগে সে টুনটুনিকে ধরবে।

ঠিক বিকেলবেলা এক ঝাঁক পাখি এল। প্রথমে তারা পুষির মতলব বুঝতেই পারেনি। এত কাছে পাখির দল দেখে পুষি টুনটুনিকে ধরার কথা ভুলে গেল। পাখির ঝাঁকের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা চড়াইছানাকে ধরে ফেলল। আর তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে তার গা থেকে ময়ূরের পালকগুলো খুলে পড়লো। ধরা পড়ে চড়াইছানাটি খুব চিৎকার জুড়ে দিল। অন্য পাখিরা তখন পুষিকে ঠোকরাতে শুরু করে দিল। দূর থেকে হুলো সব দেখছিল আর ভাবছিল, বোকা পুষি আরও একটু নাজেহাল হোক তারপর বাঁচাতে হবে। পাখিদের ঠোক্কর আর আঁচড় খেয়ে পুষি চড়াইছানাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো। কিন্তু পাখিরা পুষিকে ছাড়ল না। তারা আরও বেশি সংখ্যায় দলবদ্ধ হয়ে পুষিকে আঁচড়ে ঠুকরে আধমরা করে ফেলল।

হুলো বুঝতে পারলো এবার না গেলে পুষি মরে যাবে। তাই সে এগিয়ে গেল। হুলোকে দেখে পাখিরা পালিয়ে গেল কিন্তু টুনটুনি আর চড়াইছানাটা একটু উঁচুতে বসল। টুনটুনি বলল, দেখছেন, পুষি এর অবস্থা কী করেছে?

— তার জন্য ও যথেষ্ট শাস্তি পেয়েছে। এবার তোমরা ওকে ছেড়ে দাও, বলল হুলো। — ছাড়তে পারি কিন্তু ওকে কথা দিতে হবে আর কোনাদিন পাখিদের ধরার চেষ্ট করবে না। পুষি কথা দিল। আর হুলো ওকে নিয়ে চলে গেল। তাই দেখে বাগানের সমস্ত পাখি কোরাস গাইতে শুরু করে দিল—

দেখে যা দেখে যা, ওরে তোরা দেখে যা,
বোকা পাজি বেড়ালটা, কেমন হলো নাকালটা
ওরে তোরা দেখে যা।

বোকা পুষি আর কোনো দিন বাগানে পাখি ধরতে যায়নি।

বৃষ্টি মজুমদার

ভারতের বিপ্লবী

বিনয়কৃষ্ণ বসু

বিপ্লবী বিনয়কৃষ্ণ বসু ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকার বিপ্লবী নেতা হেমচন্দ্র ঘোষের 'মুক্তি সঙ্ঘ'-এ যুক্ত হন। তিনি ঢাকায় বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের দৃঢ় সংগঠন গড়ে তোলেন। ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে ডাক্তারি পড়ার সময় তিনি ঢাকার কুখ্যাত পুলিশ অফিসার লোম্যানকে হত্যার পর আত্মগোপন করেন। দলনেতার নির্দেশে ১৯৩০ খ্রিস্টব্দের ৮ ডিসেম্বর দীনেশ গুপ্ত ও বাদল গুপ্তের সঙ্গে রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান করে সিম্পসনকে হত্যা করেন। পুলিশ তাঁদের ঘিরে ধরলে তাঁরা পালটা গুলির লড়াই চালিয়ে যান। গুলি শেষ হলে নিজের মাথায় গুলি করে ও বিষ খেয়ে প্রাণ বিসর্জনের চেষ্টা করেন। বাদল ঘটনাস্থলেই মারা যান, বিনয় ও দীনেশকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু নিজেই মাথার ক্ষতে আঙ্গুল ঢুকিয়ে বিষাক্ত করে মৃত্যুবরণ করেন।

জানো কি?

- বীরভূম জেলার প্রধান নদী হলো বক্রেশ্বর, দ্বারকেশ্বর, ব্রাহ্মণী, ময়ূরাক্ষী, পাগলা, কুলা, শাল ও হিংলা।
- বীরভূম জেলায় ৫টি সতীপীঠ হলো ঃ বোলপুর থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে কংকালীতলা,নলহাটিতে নলাটেশ্বরী, সাঁইথিয়ায় নন্দীকেশ্বরী, বক্রেশ্বরে মহিষাসুরমর্দিনী, লাভপুরে ফুল্লরা।
- এই জেলার শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান।
- লাভপুরে কথা সহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম।

ভালো কথা

চড়াই ছানা

আমাদের বাড়ির বারান্দায় কড়িকাঠের ফাঁকে দুটো চড়াই বাসা বেঁধে ডিম পেড়েছিল। তারপর ডিম ফুটে ছানা হলে চড়াই দুটো মুখে করে খাবার এনে খাওয়াত। দিন-রাত্রি ছানাগুলো চিঁ চিঁ করে ওদের মা-বাবার কাছে খাবার চাইত। পাখা গজালে একটা ছানা একদিন বাসা থেকে পড়ে যায়। আমাদের পুষিবেড়ালটা ছুটে ছানাটিকে ধরতে গিয়েছিল। আমি ও ভাই দৌড়ে গিয়ে পুষিকে তাড়িয়ে দিয়ে ছানাটিকে ছোট্ট একটা কাগজের বাক্সে রেখে দিয়ে খাবার দিতাম। সাতদিন পর ছানাটি উড়তে শিখে ওর বাবা-মায়ের কাছে চলে যায়। এখনো মাঝে মাঝে এসে আমার ও ভাইয়ের হাত থেকে খাবার খেয়ে যায়।

সৌম্যা অধিকারী, সপ্তম শ্রেণী, ক্যানিং, দঃ ২৪ পরগনা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ক গা তি	(১) ন গো কা আ রী ত্ম প
(২) ত অ হা	(২) ল আ র্ভ ত্ম নি শী র

৪ এপ্রিল সংখ্যার উত্তর

(১) ধনভাণ্ডার (২) দিবাবসান

৪ এপ্রিল সংখ্যার উত্তর

(১) বেতারভাষণ (২) ললাটলিখন

উত্তরদাতার নাম

(১) প্রিয়াঙ্কা কুমার, কোটশিলা, পুরুলিয়া। (২) দেবারতি সরকার, মোহনবাটি, উঃ দিনাজপুর। (৩) পুষ্কর সরদার, ক্যানিং, দ: ২৪ পরগণা। (৪) সুব্রত সাহা, পাকুড়, ঝাড়খণ্ড।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

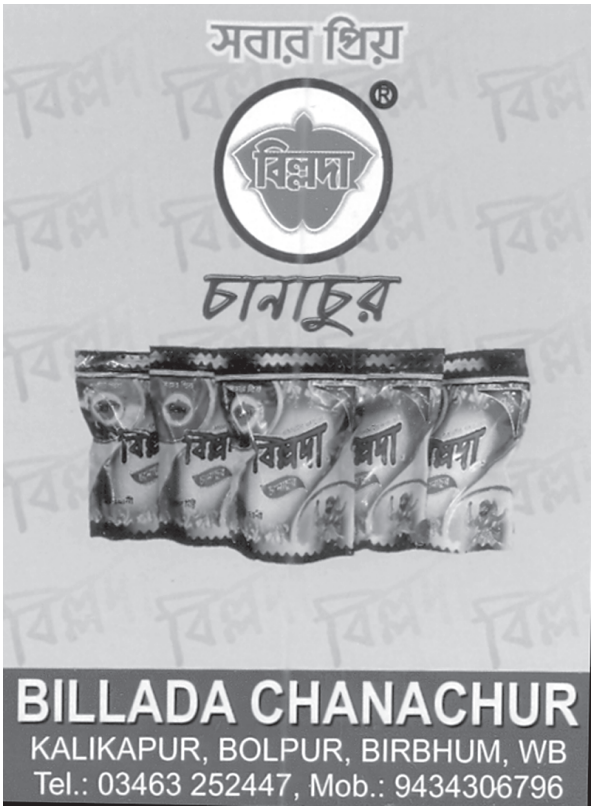

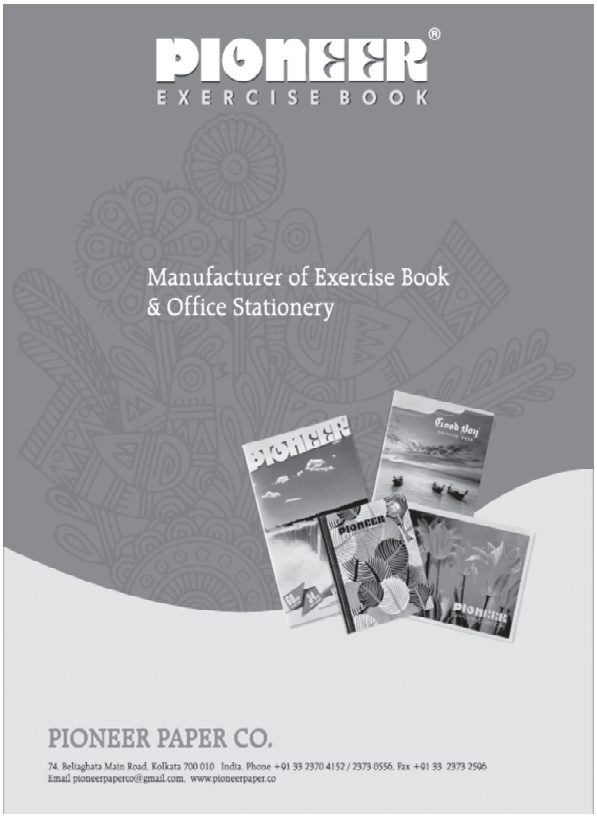

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

দলে বেলাগাম দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ সুপ্রিমো

বিশ্বপ্রিয় দাস

আমাদের রাজ্যের শাসক দলের ওপর যেন কী এক কালো ছায়া পড়েছে। সারা রাজ্যে নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনার বাড়বাড়ন্ত, ঘটনায় জড়িয়ে গেছে শাসক দলের নাম। হাসখালির পরে রায়গঞ্জ। সেখানে হুমকি আর ভয় দেখানো একেবারে ফর্মূলা মাফিক। রাজ্যের শাসক দলের সুপ্রিমো কয়েকদিন আগেও উত্তরপ্রদেশ নিয়ে বেশ সরব ছিলেন। তাঁর রাজ্যেও যখন এহেন ঘটনা ঘটল, তিনি মুখ বুজে কেন? হাসখালির পৈশাচিক গণধর্ষণে আটক হয়েছে দাপুটে তৃণমূল নেতার ছেলে। তাতে বেড়েছে সংকট।

এবার আসা যাক বগটুই কাণ্ডে, সেখানে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে আসতে চলেছে। এখন কী কী হয় সেটাই দেখার। একটি সুত্র মারফত জানা গেছে ধৃত তৃণমূল নেতা আনারুল হয়তো মুখ খুলতে পারেন, আর তাতেই নাকি রাজ্যের শাসক দলের হাঁড়ি ফুঁটো হবার সম্ভাবনা। কেননা ভাদু শেখের বাড়ি থেকে একটি ডায়েরি উদ্ধার করেছে সিবিআই। আর সেখানে প্রতি পাতার, প্রতি লাইনে রয়েছে বহু লেনদেনের খবর যা দেখে চক্ষু চড়ক গাছ গোয়েন্দাদের।

সামান্য এস এস সি কাণ্ডে এক সাংবাদিক, যিনি সাংসদ হয়েছিলেন, আবার এখন দলের মুখপাত্রও বটে, তিনি সরাসরি আঙুল তুললেন, তৃণমূল মহা সচিবের দিকে। সুতরাং আসরে নামতে হলো অন্য এক মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে। এখন সাধারণ মানুষ শাসক দলের এই বাগবিতণ্ডা বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে। এদিকে আদালতে ঘটছে নানা ওলটপালট করা ঘটনা। সেখানে শান্তি প্রসাদের অশান্তির জবানবন্দি অশান্তিতে ফেলেছে সরকারকে, অন্যদিকে আদালতের করে দেওয়া কমিটির রিপোর্ট আরও অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে সরকারকে। ওই কমিটি ইতিমধ্যেই

কাঠগড়ায় তুলেছে রাজ্যের তৎকালীন মন্ত্রী থেকে শুরু করে তাঁর করে দেওয়া কমিটির সবার দিকেই। ফলে অনেক রাঘব বোয়ালের সেই জালে আটকে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আদালতের কাছে এই বার্তা পৌঁছেছে যে নিয়োগ করা সিংহভাগ প্রার্থীই কৃতকার্য হননি যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষায়।

রাজ্যের শাসক দলের অবস্থা এখন যে অবস্থায়, সেখান থেকে রাজনৈতিক মহলের মতে, আগে নিচু তলায় ঘুন ধরে গিয়েছিল, এবার উপর তলায়। একেবারেই নিয়ন্ত্রণ নেই সমর্থকদের ওপর। তাঁর ফলে সারা রাজ্য জুড়ে অশান্তির একটা বাতাবরণ তৈরি হয়েছে।

কেন্দ্রকে দোষ দিয়ে সাধারণ মানুষের মনকে বিপথে চালিত করার একটা প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে তৃতীয় বারের জন্য জিতে আসা রাজ্যের শাসক দলের। যেমন সরকারি চাকুরেদের পরোক্ষে বেতন না হবার ভয় দেখিয়ে ডিএ না দেবার ফন্দি এঁটেছে। সেটাও বুঝে গেছে রাজ্যের সরকারি কর্মচারীরা। এর কারণ কেন্দ্রের সঙ্গে ফারাক এতটাই যে, সেটা রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। তাঁরা এবার দুই দফায় আন্দোলনে নামতে চলেছেন। সেই আন্দোলনকে তাঁরা এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাইছেন, সেখান থেকে অস্বস্তিতে পড়তে হতে পারে রাজ্যের শাসক দলকে।

রাজ্যের সাধারণ মানুষের কথা একেবারেই চিন্তা করছে না রাজ্যের সরকার। জিনিসপত্রের দামে লাগাম ছাড়া বৃদ্ধি নাভিশ্বাস তুলছে সাধারণ মানুষের। এই সমস্যার সমাধান কী করে হবে তা নিয়ে না ভাবার পাশাপাশি, কেন্দ্রের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দায় এড়াবার একটা কৌশল সরকার নিচ্ছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই কৌশল খুব একটা গ্রহণযোগ্য হবে না। □

অসমে সঙ্ঘ কাজের বিস্তার এবং হৃদয় বিদারক ইতিহাস

অসিত চক্রবর্তী

সূচনা লগ্নে অসমে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাজ দাঁড় করানো সহজ ব্যাপার ছিল না। নানারূপ প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে সঙ্ঘকে লড়তে হয়েছিল একা, নিতান্তই একা। আজকের মতো সঙ্ঘের কোনো সহযোগী সংগঠনও তখন ছিল না। ছিল হাতে গোনা কয়েকজন কার্যকর্তা। এমনকী সঙ্ঘের কোনো কার্যালয়ও তখন ছিল না। ছিল না সংগঠনের

নিজস্ব কোনো যানবাহন। যাতায়াতের একমাত্র সঙ্গী ছিল সাইকেল। সঙ্ঘের প্রচারকদের দৈনন্দিন থাকা খাওয়ার নির্দিষ্ট কোনো ব্যবস্থা ছিল না। স্থানীয় লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বাড়িতে বাড়িতে প্রচারকদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হতো। প্রচারক ছাড়া মুষ্টিমেয় কিছু গৃহী কার্যকর্তাদের ত্যাগ, সংকল্প, নিষ্ঠা ও দৃঢ়তাকে সম্বল করে অসমে শুরু হয়েছিল সঙ্ঘের দীর্ঘপথ চলা। সেপথ কখনোই মসৃণ ছিল না, ছিল পর্বতপ্রমাণ বাধা আর সীমাহীন বিরোধিতায় ভরা। এভাবে কিছুদিন কাটতে না কাটতেই চ্যালেঞ্জ হিসাবে সঙ্ঘের সামনে চলে আসে গান্ধীজী হত্যার সঙ্গে সঙ্ঘকে জড়িয়ে ফেলার এক বৃহৎ ষড়যন্ত্র। নাথুরাম গড়সে নাকি সঙ্ঘের লোক। কোর্টের রায়ে সঙ্ঘকে সম্পূর্ণ নির্দোষ ছাড়পত্র দেওয়া সত্ত্বেও বিরোধিতা তখনও ছিল, আজও আছে। সারা ভারতের সঙ্গে অসমেও সেই একই বিরোধিতার মুখে সঙ্ঘকে পড়তে হয়েছিল প্রবলভাবেই।

পঞ্চাশের দশকের কথা। অসমের অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে বিরিঞ্চী বরুয়ার লেখা একটি প্রবন্ধ বের হয়। তাতে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে লেখা ছিল নাথুরাম গডসে সঙ্ঘের সদস্য ছিলেন, যিনি গান্ধীজীকে হত্যা করেছিলেন। ওই সময় সঙ্ঘের প্রচারক হয়ে অসমে আসেন ঠাকুর রামসিংজী। লেখাটি তাঁর নজরে পড়ে। তিনিই জয় চৌধুরী নামে এক উকিলের সাহায্য নিয়ে প্রবন্ধ লেখককে উকিলি নোটিশ পাঠাতে বাধ্য হন এবং সঙ্ঘের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে এবং সেই পাঠ্যপুস্তক সংশোধন করতে বলেন। তা নাহলে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে সঙ্ঘের পক্ষ থেকে তাকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে সঙ্ঘের দুটি শর্তই সেদিন মেনে নেওয়া হয়। কিন্তু এর পরেও দণ্ডেরাম দত্ত নামে আরেকজন অসমীয়া সাহিত্যিক 'বাপুজীর অন্তিম যাত্রা' বইটিতে অনুরূপ ভাবে গান্ধীজী হত্যার সঙ্গে সঙ্ঘকে জড়িয়ে পুনরায় দোষারোপ করেন। এছাড়া সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজারিকার 'সমকাল' ম্যাগাজিনেও গান্ধীহত্যার জন্য সঙ্ঘকে দায়ী করা হয়। এইভাবে অসমে সঙ্ঘের কাজে শুধুমাত্র বাধা বা বিরোধই নয়, ছিল প্রতিনিয়ত প্রাণশাশের হুমকিও। এছাড়া সংঘর্ষ ছিল মতাদর্শের। সঙ্ঘের ভারতীয় আদর্শ বা মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ বনাম ভাষিক জাতিবাদ, আঞ্চলিকতাবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদ। অর্থাৎ সূচনালগ্নেই অসমে সঙ্ঘকাজের অগ্রগতিতে বাধা পড়ছিল ত্রিবিধ। প্রথমত, ছাত্র সংগঠন আসুর 'বিদেশি খেদা' আন্দোলনে উত্তপ্ত অসম। দ্বিতীয়ত, উগ্রবাদী সংগঠন আলফার স্বাধীন অসমের ডাকে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত ছিল অসম। তৃতীয়ত, ইসলামিক মোল্লাবাদীদের মদতে ও উগ্র কার্যকলাপে অশান্ত হয়ে উঠেছিল অসম।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যে অসমে অসমীয়ারা ছিল মূলত সহজ, সরল অন্তর্মুখী জাতি। অসমের বাইরেও যে বিশাল ভারত ভূখণ্ড আছে, তাকে জানতে বা অসমের বাইরে যেতে তাদের ভীষণ অনীহা ছিল। সরকারি চাকুরিতে তাদের বিশেষ কোনো আগ্রহ ছিল না। ইংরেজি ভাষা জানা লোকের বড়োই অভাব ছিল। তারা থাকতে চেয়েছিল শুধুমাত্র অসমীয়া জনগোষ্ঠীকে নিয়ে নিজের মতো করে এক সুখী জীবনে। সেই সময় পরাধীন ভারতে সরকারি কাজে নিযুক্ত হয়ে প্রচুর হিন্দু বাঙ্গালি অসমে আসে। চা-বাগানে কাজ করতে আসে

বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও ওড়িশা থেকে হাজার হাজার লোক। তারপর সাউদুল্লা মন্ত্রীসভার সময়ে Grow More Food পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করতে বাংলাদেশ থেকে মুসলমানদের আগমন ঘটতে থাকে। উপরন্তু, দেশভাগের পর বাংলাদেশ থেকে অত্যাচারিত হিন্দু বাঙ্গালিরা অসমে আসে শরণার্থী হয়ে। সবকিছু মিলিয়ে অসমের জনবিন্যাস ধীরে ধীরে বদলাতে থাকে। সেইসময় অসমের সরকারি ভাষা ছিল বাংলা এবং তা হয়েছিল ব্রিটিশদের ইচ্ছানুসারেই। চারপাশে অ-অসমীয়াদের বাড়বাড়ন্ত অবস্থা দেখে প্রমাদ গুনতে লাগলো অসমীয়ারা।

প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর লোক গণনা দেশের অন্যান্য অংশের মানুষের কাছে একটা রুটিন মাফিক ব্যাপার। কিন্তু অসমে অসমীয়াদের কাছে এটা উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের ভয় ছিল জনগণনায় তারা ভাষিক সংখ্যালঘু হয়ে পড়ছে না তো? ভয় ছিল পরবর্তী জনগণনায় তাদের কী হবে? সেই উদ্বেগ উৎকণ্ঠা থেকেই অসমে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত। বাংলাদেশি মুসলমানেরা নিজেদের স্বার্থরক্ষা ও মাটি দখলের লক্ষ্যে লোকগণনায় নিজেদের মাতৃভাষা অসমীয়া বলে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাতে নাম লেখাতে থাকে। বাকি রইল হিন্দু বাঙ্গালিরা, যারা মাতৃভাষা নিয়ে আপোশ করেনি। অসমীয়াদের মনে হলো তাদের ভাষা-সংস্কৃতির দুর্গতির মূলে হিন্দুবাঙ্গালিরা। সেই সময় হরচন্দ্র গোস্বামীর অসমীয়া ভাষা প্রবন্ধে সেটার উল্লেখ ছিল। যা রীতিমতো অষ্টম ও নবম শ্রেণীর পাঠ্য বইয়ে পড়ানো হতো। তিনি পণ্ডিত ব্যক্তি হলেও বিষয়টি যে অসত্য ও আপত্তিকর ছিল এতে কোনো সন্দেহ ছিল না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে একদা অসমে শুরু হলো হলো 'বঙ্গাল-খেদা' আন্দোলন। নাসের আহমেদ নামে এক আন্দোলনকারী হঠাৎই 'বহিরাগত হঠাও' স্লোগানের সূত্রপাত করেন। এতে সমস্ত অ-অসমিয়াদের সঙ্গে অসমিয়ারা সংঘর্ষে লিপ্ত হলেন। অ-অসমীয়া বলতে ভারতেরই অন্য রাজ্য থেকে আসা হিন্দিভাষী মাড়োয়ারি, বিহারি, গুজরাটি সবাই।

এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরসজী অসমের পরিস্থিতি সরজমিনে অধ্যয়ন করেন। কুপ্পহল্লী সীতারামাইয়া সুদর্শনজী তখন ছিলেন অখিল ভারতীয় বৌদ্ধিক প্রমুখ। তাঁর উপর ছিল অসমের বিশেষ দায়িত্ব। অসম আন্দোলনকে ভারতীয়তার মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে সঙ্ঘের অনুপ্রেরণায় গঠিত হলো অসম জাতীয়তাবাদী যুবমোর্চা। জরুরিভিত্তিক একটি লিফলেট ছাপিয়ে শুরু হলো জনসম্পর্ক অভিযান। তাতে যে আহ্বান করা হয়েছিল, তার মুখ্যবিন্দু ছিল চারটি।

১. বহিরাগত শব্দ বাদ দিয়ে অবৈধ বাংলাদেশিদের বহিঃস্করণ করতে হবে। ২. বাংলাদেশ থেকে আগত নাগরিক মাত্রেই অবৈধ বিদেশি নয়। যেসব হিন্দু অত্যাচারিত হয়ে অসমে আশ্রয় নিয়েছেন, তারা শরণার্থী পর্যায়ের। তাদের চিরদিনের আশ্রয়স্থল ভারতবর্ষ। ৩. আর যারা কেবলমাত্র সংখ্যাবৃদ্ধি ও ভূমিদখলের জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে অসমে প্রবেশ করেছে তারা অবৈধ বিদেশি নাগরিক। ৪. তাদের শনাক্তকরণ ও বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হোক।

যে আদর্শকে সামনে নিয়ে সঙ্ঘ আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষে সঙ্ঘকার্য বিস্তার করে চলেছে তার প্রাণভোমরা হলো হিন্দুত্ব। হিন্দুত্ব মানে ভারতীয় রাষ্ট্রবোধ। ভারতীয় রাষ্ট্রবোধে হিন্দু সংস্কৃতিই মুখ্য; ভাষা নয়। স্থান ও অঞ্চল ভেদে ভাষা অনেক, কিন্তু হিন্দু-সংস্কৃতি তাদের মুখ্যজীবনধারা। সঙ্ঘ ভারতের প্রতিটি মাতৃভাষার প্রতি সমভাবে শ্রদ্ধাশীল। তাই সঙ্ঘের বিদ্যালয়গুলিতে মাতৃভাষার মাধ্যমেই পাঠদান হয়। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অসমীয়া এবং বরাকে বাংলা। তাই ভারতের মূল চালিকাশক্তি ও জীবনীশক্তি হলো হিন্দুত্ব। ভাষাগত ও অঞ্চলগত ভিন্নতাকে সরিয়ে সমগ্র অসমের মাটিতে হিন্দুত্বকে তুলে ধরতে হবে। সে লক্ষ্যের বাস্তবায়নে ১৯৮১ সালে অসমে বিশাল হিন্দু সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। সে সময়ের সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরসজীরও তাতে আগ্রহ ছিল। সম্মেলনের স্থান হিসাবে বেছে নেওয়া হলো নগাঁও জেলাকে। যদিও জেলাটি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ। সম্মেলনের জন্য নাগরিক সমিতি তৈরি হলো। কিন্তু আসু ছাত্র সংগঠনের চাপ ক্রমাগত বৃদ্ধিতে অনেকেই সদস্যপদ ছেড়ে দেন। সাহসী যাঁরা ছিলেন সেই মুষ্ঠিমেয় সদস্যের মাধ্যমে নেহরু বালি মাঠে মণ্ডপ নির্মাণ-সহ যাবতীয় প্রস্তুতি এগোতে থাকে।

অবশেষে আসুর ক্যাডাররা সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়। তারা দলবল নিয়ে প্যান্ডেল ভাঙতে আসে। ভবেন্দ্র নাথ মেধী নামে এক কার্যকর্তা সামনে এগিয়ে এসে হুংকার ছেড়ে বলেন যারা মণ্ডপ ভাঙতে যাবে, তারা যেন তাদের মা-বাবার কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়ে আসে। তারপর ক্ষমতা থাকে যদি ভাঙবে। সামান্য ক'জন মানুষের এত সঙ্ঘবদ্ধতা ও সাহস দেখে আসুর বাহিনী পিছু হটে। এরপর যুব ও বয়স্করা আসে সম্মেলন বন্ধ করতে। প্রথম ভয়, পরে নানা বাহানায় সম্মেলন বন্ধের কৌশল চালায়। উপস্থিত কার্যকর্তা প্রফুল্ল বরা মুখের উপর স্পষ্ট জবাব দেন, সম্মেলন বন্ধ করার সহজ রাস্তা হলো আমার হাতের ছুরিটি আপনাদের দেই। প্রথমে এই প্রতিরোধকের গলাটা কেটে দিন। তাতে দাঙ্গা বাঁধবে, কার্ফু হবে, সম্মেলন এতেই বন্ধ হয়ে যাবে। নির্ধারিত দিনে সম্মেলন যথারীতি অনুষ্ঠিত হলো। হাজার হাজার লোক সম্মেলনে যোগ দিলেন। পশ্চিমবঙ্গের ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী স্বামী বিজয়ানন্দজী ও তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক সুদর্শনজী সেখানে দৃঢ়কণ্ঠে বক্তব্য রাখেন।

নগাঁও সম্মেলনের সফলতার পর গৌহাটির নিউ ফিল্ড ও জজ খেলার মাঠে বিশাল হিন্দু সম্মেলন ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রতিদিন হাজার হাজার লোকের সমাগম হতো। এই সম্মেলনের বিশেষত্ব হলো প্রথমবার বিশাল প্রকাশ্য মঞ্চে স্লোগান উঠে 'ন হিন্দুঃ বিদেশি ভবেৎ'। গৌহাটি শহরকে প্রকম্পিত করে সেই স্লোগানের সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব গৃহীত হয়— বাংলাদেশ থেকে আগত হিন্দু শরণার্থীদের আশ্রয় ও নাগরিকত্ব দেওয়া হোক।

এভাবেই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মাটিতে দাঁড়িয়ে সেদিন বজ্রকণ্ঠে ভাষাবাদ ও আঞ্চলিকতাবাদের বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান ঘোষণা করে সঙ্ঘ। ভয়ে সংকুচিত হীনমন্যতাগ্রস্ত হিন্দু শরণার্থীদের অসমে বেঁচে থাকার একমাত্র প্রদীপটি প্রজ্বলন করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ।

অসমের মাটিতে শক্তপোক্ত ভাবে মাথা তুলে দাঁড়ানো ভাষাবাদ ও আঞ্চলিকতাবাদের সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতার মুখোমুখি হয় চিরন্তন ভারতীয় রাষ্ট্রবোধ। সামান্য ক'জন কার্যকর্তা একদিকে, যেন একাকী শ্রীকৃষ্ণ, অপরদিকে কৌরবপক্ষের অক্ষৌহিনী সেনা। শ্রীকৃষ্ণতো ভারতীয় রাষ্ট্রবোধ বা হিন্দুত্বের মূর্ত প্রতীক। তাই অসমে হিন্দুত্ববোধের পুনর্জাগরণের বীজ অঙ্কুরিত হতে শুরু করে। প্রখ্যাত সাংবাদিক হোমেন বরগোঁহাঞি এক সময় কিছুটা এগিয়ে এসে স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, অসমীয়া সমাজ শাঁখের করাতের মুখে, আসতে-যেতে দুদিকেই কাটে। যদি হিন্দু বাঙ্গালিদের মাতৃভাষা বাংলা বলে তাদের দূরে সরিয়ে দেই এবং বহিরাগত মুসলমানদের মাতৃভাষা অসমীয়া লেখানোর জন্য তাদের কোলে তুলে নেই, তাহলে অচিরেই অসম মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে পরিগণিত হবে। অসমীয়া সংস্কৃতি হারিয়ে যাবে। সুদর্শনজী বলতেন, অসমীয়দের সমস্যা সমবাহু ত্রিভুজের তিনটি কোণের পরিমাণ নির্ণয়ের মতো। একটি কোণে হিন্দু অসমীয়ারা, অপর দুটি কোণের একটি হলো অন্যান্য হিন্দুদের সমষ্টিগত সংখ্যা, অপর কোনটি হলো অসমের মুসলমানদের। কোনো দুটি কোণকে আপন করে তাদের সঙ্গে যোগ করবে, তা বেছে নিতে হবে। কাদের নিলে মঙ্গল হবে সেটা সময় থাকতে অসমীয়াদের বুঝতে হবে।

স্বাভাবিকভাবেই সে সময়ে সঙ্ঘ ও আসু ছাত্র সংগঠনের মধ্যে মতবিরোধ তুঙ্গে ওঠে। অগ্নিগর্ভ অসমে সঙ্ঘের কাজ বাড়ানো কষ্টকর হয়ে পড়ে। শিক্ষাবর্গের জন্য বর্গস্থান জোগাড় করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল। এমনকী সঙ্ঘের নাম বদল করে 'যোগ ব্যায়াম শিক্ষা শিবির' নামে শিবির করাও সহজ ছিল না। বন্ধের মধ্যেও স্কুল বা সরকারি প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করার অনুমোদন পাওয়াও কঠিন ছিল। কখনও পাওয়া যেত ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কোনো গোদাম ঘর বা ধর্মীয় আশ্রম। পরিকাঠামোগত অব্যবস্থায় বহু কষ্ট স্বীকার করে তবুও হাসিমুখে সঙ্ঘের শিক্ষাবর্গ চলত। এত প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য প্রচারকরা পর্যন্ত মাঝে মাঝে হতাশ হয়ে পড়তেন। তাদের সাহস জোগাতে সুদর্শনজী বলতেন— কাজ হোক বা না হোক, শাখা চলুক বা না চলুক অন্তত পাঁচ বছর ধৈর্যধরে থাকতে পারবে এমন কার্যকর্তা আমাদের আবশ্যক।

এরই মধ্যে ১৯৮০ সালে অসমে উগ্রবাদী সংগঠন আলফা (United Libertion Front of Assam) মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, স্বাধীন অসম গঠনের স্বপ্ন নিয়ে। অসম নাকি কোনোদিনই ভারতের অঙ্গ ছিল না। কিন্তু তাদের এই যুক্তি সত্য ছিল না। তখন অসমের অনেক নবীন ঐতিহাসিক যুক্তি সামনে রেখে বলেন, বিক্রমাদিত্য, চন্দ্রগুপ্ত বা হর্ষবর্ধনের সময়ে অসম ভারতের অঙ্গ ছিল। পরশুরাম কুণ্ড বা কামাখ্যা যেমন ভারতের একটি অন্যতম তীর্থস্থান, তেমনই গয়া, কাশী, হরিদ্বার অসমীয়াদেরও তীর্থস্থান। অসমের সর্বজনস্বীকৃত মহাপুরুষ মাধবদেবের ভারত বন্দনা এইরূপ— ধন্য ধন্য কলিকাল/ ধন্য নরতনুভাল/ধন্য ধন্য ভারতবরিহ। মহাপুরুষ শঙ্করদেবের ভারত বন্দনা এইরূপ— কোটি কোটি জন্ম অন্তরে যাহার আছে মহাপুণ্য রাশি/সেহি কদাপি মনুষ্যহবয়/ভারত বরিষে আসি। এছাড়াও কেন্দ্রের বঞ্চনা নিয়ে আলফার যে অভিযোগ ছিল, তা পরিকাঠামোর মধ্যে থেকেও আন্দোলন করা যেত, কিন্তু ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন অসম গঠনের স্বপ্ন যুক্তিযুক্ত নয়।

সঙ্ঘের অখণ্ড ভরত গঠনের স্বপ্নের বিপরীত ছিল আলফার স্বাধীন অসমের স্বপ্ন। আর সেজন্য আলফার লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়াল সঙ্ঘ। গণহত্যা, অপহরণ, বিস্ফোরণ ও ঘন ঘন বন্‌ধে বিধ্বস্ত অসমে সঙ্ঘের কাজ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আলফার আক্রমণের লক্ষ্য সঙ্ঘ হওয়ার অন্য কারণ হলো, সেসময় সঙ্ঘ অসমের মাটিতে নাবালকত্ব পর্যায় অতিক্রম করে ফেলেছে। ততক্ষণে তার শেকড় মাটির অনেক গভীরে প্রেথিত হয়ে শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। বিষয়টি বুঝতে পেরে অলফা লেগে গেল অসমের মাটি থেকে সঙ্ঘকে উৎখাত করতে। তখন কেরল থেকে মুরলীমনোহর বলে একজন প্রচারক অসমে আসেন। অসমীয়া ভাষা শিখে অসমের মানুষদের আপন করে নেওয়ার মতো ব্যক্তিত্ব ও সুদক্ষ কার্যকর্তা ছিলেন তিনি। ১৯৯০ সালে ৫ অক্টোবর অন্যান্য সঙ্ঘকর্মীদের সঙ্গে তিনিও নলবাড়ি থেকে কিছু দূরে আলফার দ্বারা অপহৃত হন। অসমে তখন অগপ-র সরকার। মন্ত্রীসভার অনেক মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলো। ওই প্রচারককে উদ্ধার করতে সাহায্য চাওয়া হলে আলাপচারিতায় বোঝা গেল মন্ত্রীদের অনেকের সঙ্গে আলফার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। একজন তো বলেই দিলেন--- আপনাদের প্রচারক জীবিত। তিনি বড়ো চতুর। তাকে অসম ছেড়ে যাওয়ার কথা বললে রাজি হননি উলটে বরং মেজাজ দেখিয়েছেন। অবশেষে তাকে আর উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

মহারাষ্ট্রের পুনে থেকে প্রচারক হয়ে আসেন প্রমোদ নারায়ণ দীক্ষিত। ১৯৯৭ সালের ১৬ আগস্ট বরপেটা সঙ্ঘ কার্যালয়ে ঢুকে উগ্রবাদীরা তাঁকে গুলি করে হত্যা করে। ওমপ্রকাশ চতুর্বেদী আসেন উত্তরপ্রদেশ থেকে, এই প্রচারককেও উগ্রবাদীরা এক শোকসভাতে পেছন থেকে এসে গুলি করে হত্যা করে। এভাবেই দূর দূর থেকে আসা গৃহত্যাগী, নিঃস্বার্থ, সেবাব্রতী প্রচারকদের হত্যা করতে লাগল আলফা উগ্রবাদীরা। বাদ গেলেন না অসমের গৃহী কার্যকর্তারাও। তাদেরও শেষ করে দিতে আলফার যোজনা তৈরি হলো। সীমান্ত লাগোয়া সদিয়াতে সঙ্ঘের কাজ ভালো ছিল। ১৯৯৬ সালে সেখানকার জেলা কার্যবাহ ৩০ বছরের যুবক প্রফুল্ল গগৈকে রাস্তা থেকে অপহরণ করে। আজও তার সন্ধান মেলেনি। এভাবেই নলবাড়ি জেলার তরুণ শিক্ষক ও সঙ্ঘের বিভাগ কার্যবাহ শুক্লেশ্বর মেধীকে বিদ্যালয়ের সামনেই আলফারা গুলি করে হত্যা করে। তেমনই তরুণ স্থানীয় সঙ্ঘ প্রচারক হেমন্ত গগৈকে উগ্রবাদীরা গুলি করে। তবুও এত ভয়-ভীতি, আতঙ্কময় পরিবেশের মধ্যেও দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ সঙ্ঘকর্মীদের কাজ কিন্তু আটকে থাকেনি।

পরিশেষে বলতে হয় আজ অসমের বহুলাংশে যে অনুকূল পরিবেশ পরিলক্ষিত হয়েছে, তুলনামূলক ভাবে রাজনৈতিক বিশ্বাসের যে পরিবেশ অনুভূত হচ্ছে, তা ভারতীয় রাষ্ট্রবোধ অসমের মাটিতে পুনর্জাগরণ কিছুটা সম্ভব হয়েছে বলে। আর তা সম্ভব হয়েছে সঙ্ঘের বহু প্রচারকের আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে। □

নববর্ষে নতুন করে বাঙ্গালি হিন্দুর স্বার্থরক্ষার শপথ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ১৪২৯ বাংলা নববর্ষের প্রাক্কালে গত ৯ এপ্রিল কেশব ভবনে প্রতিবারের মতো এবারও আয়োজিত হলো স্বস্তিকার নববর্ষ সংখ্যার প্রকাশ অনুষ্ঠান। নতুন বছরে বাঙ্গালি হিন্দুর স্বার্থরক্ষায় স্বস্তিকার কণ্ঠকে আরও উচ্চগ্রামে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকারে বিশিষ্ট জনদের উপস্থিতিতে পুরো অনুষ্ঠানটি অন্য মাত্রা পেয়েছিল।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড.নারায়ণ চক্রবর্তী এবং প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও গবেষক বিনয়ভূষণ দাশ। এই বছর স্বস্তিকা সম্মান লাভ করেন পত্রিকার একদা

দীর্ঘদিনের কর্মী তথা সাংবাদিক পিনাকপাণি ঘোষ। এছাড়াও মঞ্চে ছিলেন স্বস্তিকার প্রকাশক সারদাপ্রসাদ পাল ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক অজয় নন্দী।

যথারীতি প্রদীপ প্রজ্বলন এবং ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। মঞ্চাসীন ব্যক্তিবর্গ স্বস্তিকার নববর্ষ সংখ্যা, যার বিষয় ছিল বাঙ্গালির নবজাগরণ, তার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন। স্বাগত ভাষণে সারদাপ্রসাদ পাল উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এই অন্ধকার সময়ে স্বস্তিকাই আলোর বিদ্যুৎরেখা। বিনয়ভূষণ দাশ তাঁর বক্তব্যে বর্তমান সময়ে চলা একটি ভ্রান্ত মত 'বঙ্গাব্দের প্রবর্তক আকবর' নিখুঁত যুক্তিসহকারে খণ্ডন করে এই বর্ষগণনার প্রকৃত প্রবর্তক যে রাজা শশাঙ্ক তার পক্ষে সওয়াল করেন। ড. নারায়ণ চক্রবর্তী বলেন, দীর্ঘ বাম শাসনে পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি হিন্দুরা মেরুদণ্ডটাই হারিয়ে ফেলেছে। তাদের বঙ্গাব্দ পর্যন্ত চুরি হয়ে যাচ্ছে, সে বিষয়ে তাদের খেয়াল নেই।

স্বস্তিকা সম্মানে দৃশ্যতই আপ্লুত পিনাকপাণি ঘোষ তাঁর এই সম্মান প্রাপ্তিকে সাংবাদিকতায় ঘরে ফেরার সঙ্গে তুলনা করেন। তাঁর বক্তব্যে বারংবার স্বস্তিকার প্রাক্তন সম্পাদক কিংবদন্তী ভবেন্দু ভট্টাচার্যের নাম উঠে আসে। তাঁর হাতে স্বস্তিকা সম্মান তুলে দেন স্বস্তিকার আরেক প্রাক্তন সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য। নবাঙ্কুর বিভাগে নিয়মিত অংশগ্রহণের জন্য মৌমিতা দেবনাথকে সম্মানিত করেন স্বস্তিকার লেখিকা সুতপা বসাক ভড়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন স্বস্তিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সদস্য সন্দীপ চক্রবর্তী এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সম্পাদকীয় বিভাগের আর এক সদস্য নিখিল চিত্রকর। □

মধ্যবিত্তদের স্বস্তি দিচ্ছে প্রধানমন্ত্রী জন-ঔষধি যোজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এই অর্থবছরের পরিসংখ্যান অনুসারে, প্রধানমন্ত্রী জনঔষধি কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে ৮০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের ওষুধ বিক্রি হয়েছে। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত মানুষরা জনঔষধি কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে প্রায় ৫০০০ কোটি টাকা সাশ্রয় করতে পেরেছেন। যদি এই প্রকল্প শুরু হওয়ার পর থেকে সমস্ত সঞ্চয় যোগ করা হয়, তাহলে দেখা যাবে মোট যোগফল ১৩,০০০ কোটি টাকার সীমা স্পর্শ করেছে। ভবিষ্যতে স্বাস্থ্য সংকট মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকার ক্রমাগত স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করছে। এই মিশনের অংশ হিসেবে, সারা দেশে ৮৬৭৫টি জনঔষধি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এই কেন্দ্রে সর্বসাধারণ বাজার মূল্যের থেকে ৫০-৯০ শতাংশ কম দামে ওষুধ কিনতে পারেন।

এই কেন্দ্রগুলি থেকে মহিলাদের জন্য এক টাকায় স্যানিটারি ন্যাপকিনও পাওয়া যায়। এখনও পর্যন্ত এই কেন্দ্রগুলি থেকে ২১ কোটিরও বেশি স্যানিটারি ন্যাপকিন বিক্রি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৭ মার্চ জনঔষধি কেন্দ্রের মালিক এবং প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সঙ্গে বাক্যালাপ করেন। জেনেরিক ওষুধের ব্যবহার এবং জনঔষধি প্রকল্পের উপকারিতা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে ১ মার্চ থেকে জনঔষধি সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে। এর প্রতিপাদ্য হলো 'জনঔষধি-জন উপযোগী'।

বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের অর্ধেক আসনে খরচ হবে সরকারি কলেজের মতো

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ চিকিৎসাশাস্ত্র পড়তে আগ্রহী লক্ষাধিক শিক্ষার্থীর স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এখন বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের ৫০ শতাংশ আসনে সরকারি কলেজের মতোই খরচ হবে। জন ঔষধি দিবস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিষয়টি টুইট করে জানিয়েছেন। এই নতুন নির্দেশিকা আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রযোজ্য হবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও ডিমড্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও এই সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হবে। মেধার ভিত্তিতে যোগ্য শিক্ষার্থীরা প্রথমে এই সুযোগ পাবেন।

একটা বিষয় লক্ষণীয় যে গত সাত বছরে ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে ভারত সরকার স্বাস্থ্য ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করার জন্য একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। অতিরিক্ত খরচের বোঝার জন্য বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হতে পারছেন না এমন শিক্ষার্থীরা এখন স্বস্তি পাবেন।

দেরাদুন স্কুল পড়ুয়ার শিল্পকর্মে মুগ্ধ প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের তরুণ প্রজন্ম বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে মাঝে মাঝেই কথা বলে তাদের মনোবল বৃদ্ধি করেন। সেটা 'মন কি বাত' হোক, 'পরীক্ষা পে চর্চা' হোক বা ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনা হোক। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে দেরাদুনের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র অনুরাগ রামোলার চিঠির উত্তর দেওয়ার সময় তিনি তার শিল্পকর্মের প্রশংসা করেছিলেন। অনুরাগ রামোলা শিল্প ও সংস্কৃতির জন্য ২০২১ সালে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় শিশু পুরস্কার সম্মান পায়। গত বছরের ডিসেম্বরে অনুরাগ একটি চিত্র অঙ্কন করেছিল। চিত্রকর্মটির প্রতিপাদ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতার ৭৫তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে পালিত অমৃত মহোৎসব। ছবি আঁকার পাশাপাশি অনুরাগ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে একটি চিঠিও লিখেছিল। অনুরাগের চিন্তাভাবনা ও আদর্শ দেখে প্রধানমন্ত্রী মুগ্ধ হন। চিঠির উত্তরে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'তোমার লেখার মধ্যেই তোমার আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে। তোমার আঁকা ছবিটির মধ্যে ভারতের স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের জন্য নির্বাচিত প্রতিপাদ্যটি যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা এটা দেখে খুব ভালো লাগল যে জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলি তোমাকে এত কম বয়সে ভাবিত করেছে। একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে দেশের উন্নয়নে তুমি তোমার ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন।'

অনুরাগকে উৎসাহিত করতে তার আঁকা ছবিটি নরেন্দ্র মোদী অ্যাপ এবং ওয়েবসাইট-এও আপলোড করা হয়েছে।

আয়ুষ্মান ভারতে উপকৃতদের মধ্যে ৪৬ শতাংশের বেশি মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৫০ কোটিরও বেশি মানুষ প্রতি বছর পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা পান। দরিদ্রদের পাশাপাশি মহিলাদের জীবনে এই প্রকল্প আশীর্বাদ স্বরূপ হয়ে উঠেছে। একটি নতুন সমীক্ষা অনুসারে, ২০১৯ সালের অক্টোবর থেকে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের মধ্যে ৪৬.৭ শতাংশ মহিলা। মণিপুর, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, বিহার, ছত্তিশগড়, গোয়া, পুদুচেরি, লাক্ষাদ্বীপ, কেরল এবং মেঘালয়ে আয়ুষ্মান কার্ডধারীদের মধ্যে পুরুষদের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেশি। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৮ সালে বিশ্বের বৃহত্তম স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প হিসাবে এটি শুরু করেছিলেন। এখন এই প্রকল্পের পরিধি সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রায় ২৭,৩০০টি বেসকারি ও সরকারি হাসপাতাল এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত। এই প্রকল্পের অধীনে এমন ১৪১টি চিকিৎসা পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য।

মুঙ্গের থেকে খাগরিয়ার দূরত্ব কমালো শ্রীকৃষ্ণ সেতু

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বিহারের মুঙ্গের তার সমৃদ্ধ ইতিহাস, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং বাণিজ্যের জন্য সুপরিচিত। এটি বিহারের অন্যতম প্রসিদ্ধ পর্যটন ও তীর্থস্থানও। আগে উত্তর বিহারে যাওয়ার জন্য সেখানকার বাসিন্দাদের ৭০ কিলোমিটার দূরে মোকামায় রাজেন্দ্র সেতু এবং ৭৫ কিলোমিটার দূরে ভাগলপুর থেকে বিক্রমশিলা সেতু ব্যবহার করতে হতো। জাতীয় সড়ক ৩৩৩বি-এর অধীনে গঙ্গানদীর উপর ১৪.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ রেল-কাম-রোড ব্রিজ এক্সেস রোড প্রকল্পের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। এর জন্য খরচ হয়েছে ৬৯৬ কোটি টাকা। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহণ মন্ত্রী নীতীন গড়করি এই সেতুর উদ্বোধন করেন। সেতুতে যান চলাচল শুরু হওয়ার ফলে এখন মুঙ্গের থেকে খাগরিয়ার মধ্যে ১০২ কিলোমিটার এবং মুঙ্গের-বেগুসরাইয়ের মধ্যে ২০ কিলোমিটার দূরত্ব হ্রাস পেয়েছে। এর ফলে মুঙ্গের খাগরিয়া, সহরাসা যেতে প্রায় তিন ঘণ্টা এবং বেগুসরাই সমস্তিপুর যেতে প্রায় ৪৫ মিনিট সময় বাঁচবে। সিদ্ধ শক্তিপীঠ চণ্ডীস্থান, ঋষি কুণ্ড ও সীতা কুণ্ড দর্শন করতে আসা ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও এটি মুঙ্গের এবং মুঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক দুর্গে পর্যটকদের সংখ্যাও বৃদ্ধি করবে।

১০,০০০ সৌর ক্ষমতার রেকর্ড ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত সিওপি-২৬ বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন ২০৭০ সালের মধ্যে ভারতের নেট-ডিরো স্তরে পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করেছিলেন, সারা বিশ্ব সেই প্রস্তাবের প্রশংসা করেছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শুধুমাত্র লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেই থেমে যাননি, তিনি সেই লক্ষ্য পূরণের জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনাও প্রস্তুত করেছিলেন। জ্বালানি ক্ষেত্রের গবেষণা ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান 'মারকম ইন্ডিয়া রিসার্চে'র সর্বশেষ প্রতিবেদনে সেই চিত্র ধরা পড়েছে। সেই প্রতিবেদন অনুসারে ভারত ২০২১ সালে রেকর্ড ১০ হাজার মেগাওয়াট সৌর ক্ষমতা স্থাপন করেছে। বছরের হিসেবে তা ২১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে ২০২১ সালের ডিসেম্বরের শেষে ভারতে ক্রমবর্ধমান সৌর ক্ষমতা প্রায় ৪৯,০০০ মেগাওয়াট ছিল। ২০২১ সালে বিদ্যুৎ শক্তিতে সৌরশক্তির অবসান ছিল ৬২ শতাংশ যা এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বৃহৎ অংশ। গত বছরে যে সকল বড়ো সৌর প্রকল্পগুলি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তার থেকে ৮৩ শতাংশ সৌরশক্তি পাওয়া গিয়েছে। বছরের হিসেবে ২৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিবেদনের পরিসংখ্যানগুলি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভাবনাও প্রতিফলিত করে। সাম্প্রতিক বাজেট ওয়েবনারে তিনি বলেন, '২০৩০ সালের মধ্যে আমাদের অ-জীবাশ্ম জ্বালানি উৎস থেকে শক্তির ক্ষমতার ৫০ শতাংশ অর্জন করতে হবে। ভারত নিজের জন্য যে লক্ষ্যই স্থির করুক না কেন, তার বাস্তবায়নে কোনো সমস্যা হবে না।'

।। চিত্রকথা।। শ্রীগুরুজী।। ২৮।।